

প্রথম প্রকাশ :
জুন, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশক :
শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট্
কলিকা[illegible]

মুদ্রক :
শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
দেশবাণী মুদ্রণিকা
১৪/সি, ডি. এল. রায় স্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী
অলংকরণ : দীপায়ন বাগচি
ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
প্রচ্ছদ-মুদ্রণ : মোহন প্রেস, কলিকাতা ৯

‘যুগ[illegible] [illegible]ত্রিকার

বার্তা-সম্পাদক ও

সুনিপুণ কথাশিল্পী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

—সুহৃদ্বরেষু।

কলিকাতা

জুন, ১৯৫৭

ম. বা.



এক

আজ থেকে একশো বছরের কিছু বেশী আগেকার কথা।

ভারতবর্ষে তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। এই কোম্পানীর তরফে ভারতের ভাগ্যবিধাতা তখন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসি। তাঁর অদ্ভুত শাসনের মহিমায় বীরের দেশ পাঞ্জাব কোম্পানীর অধীনে এসেছে, পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের বিখ্যাত খাল্‌সাবাহিনী ভেঙে দিয়ে বীর শিখদের নিরস্ত্র করা হয়েছে, আর

অযোধ্যা প্রভৃতি অনেক স্বাধীন রাজ্য কোম্পানীর দাসত্ব-শৃংখলে বাঁধা পড়েছে। রণজিৎ সিংহের মুকুটের জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর পর্যন্ত কোম্পানী বাহাদুর হস্তগত করেছেন ছলে, বলে ও কৌশলে।

ডাল্‌হৌসির ছিলো সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা মেটাবার জন্যে তিনি এক নতুন আইন তৈরী করলেন। বলা হলো, অপুত্রক বা নিঃসন্তান সামন্ত-রাজাদের মধ্যে কেউ যদি দত্তক নিতে চান, তা'হলে কোম্পানীর সরকারকে দিয়ে সেই দত্তক-গ্রহণ অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। সরকার অনুমোদন না ক'রলে সেই দত্তক-গ্রহণ আইনত সিদ্ধ হবে না। কোন রাজাই কোম্পানীর অনুমতি এবং অনুমোদন ছাড়া কাউকে পোষ্যপুত্র নিতে পারবেন না। পোষ্যপুত্র নেওয়া সরকার যদি অনুমোদন না করেন, তবে সেই রাজ্য কোম্পানীর উদরসাৎ হবে।

এই অদ্ভুত আইনের ফলে প্রথমেই সেতারা-রাজ্য ইংরেজের অধীনে চলে গেলো। এই সেতারাই একদিন ছিলো ছত্রপতি শিবাজীর শক্তির পীঠস্থান। এই সেতারার দুর্গ থেকেই শিবাজী সেদিন দুর্ধর্ষ মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা অটুট রাখবার জন্যে। এই সেতারার দুর্গ থেকেই শিবাজী তাঁর গুরু রামদাস স্বামীকে একদিন ভিক্ষা করতে দেখে সমস্ত

মহারাষ্ট্র রাজ্য তাঁরই চরণে নিবেদন করেন। শিবাজীর স্মৃতিপূত সেই সেতারা লর্ড ডাল্‌হৌসি উদ্ভট এক আইনের জোরে কেড়ে নিলেন। সেতারার রাজা, শিবাজীর বংশধর, প্রতাপসিংহকে রাত্রির অন্ধকারে বিনা বিচারে কাশীতে নির্বাসন দেওয়া হলো। বাজেয়াপ্ত করা হলো তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তি।

ডাল্‌হৌসির এই জবরদস্ত শাসন-নীতিতে অসন্তোষ দেখা দিলো ছোট-বড় সব সামন্ত-রাজাদের মধ্যে। অসন্তোষ দেখা দিলো বটে, কিন্তু সাহস করে কেউই এর কোন প্রতিবাদ করতে পারলো না। কোম্পানীও ক্রমেই কায়েম হ'য়ে বসলো ভারতের মাটিতে।

সেতারার পর ডাল্‌হৌসির দৃষ্টি পড়লো বুন্দেলখণ্ডের ওপর। বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে একটি ছোট রাজ্য ছিলো; নাম, ঝাঁসি। তখন ঝাঁসির রাজা ছিলেন গংগাধর রাও। তিনি অপুত্রক। গংগাধরের খুব অসুখ। কী জানি কি হয়--এই ভেবে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধির সামনে যথারীতি অনুষ্ঠান ক'রে একটি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন সামন্ত-রাজ্যে কোম্পানীর যে-সব প্রতিনিধি থাকতেন সে যুগে, তাঁদের বলা হতো 'রেসিডেণ্ট'। মারা যাবার আগে গংগাধর রেসিডেণ্টকে লিখলেন: "কোম্পানীর সরকারের সংগে সন্ধি অনুসারেই আমি এই দত্তক নিয়েছি। যদি আমি

অসুখ থেকে সেরে উঠি আর যদি আমার নিজের পুত্র জন্মে, তা'হলে যা করতে হয় আমিই করবো। আর যদি আমি না বাঁচি, তবে যেন কোম্পানী অনুগ্রহ করে আমার স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈ ও এই দত্তক ছেলেকেই ঝাঁসির মালিক বলে, স্বীকার করেন এবং তাঁদের রক্ষা করেন।"

ঝাঁসির রেসিডেণ্ট গংগাধরের সেই আবেদন-পত্র পাঠিয়ে দিলেন লর্ড ডাল্‌হৌসির কাছে। কিন্তু তিনি তখন তাঁর জবরদস্ত নীতি অনুসারে কোম্পানীর রাজ্য-বিস্তারে উন্মত্ত। ঝাঁসির রাজার এই আবেদন-নিবেদনে ডাল্‌হৌসি কান দিলেন না, গ্রাহ্যই করলেন না তাঁর যুক্তি। গংগাধর অপুত্রক—এই অছিলায় তিনি ঝাঁসি-রাজ্য কোম্পানীর দখলে আনবার আদেশ দিলেন।

এদিকে গংগাধরের মৃত্যু হলো। তাঁর রানী, বীরাংগনা লক্ষ্মীবাঈ নাবালক ছেলের পক্ষে রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। কোম্পানীর সরকারকে সন্ধির কথা মনে করিয়ে দিয়ে অনেক যুক্তি দেখালেন তিনি, বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়ে সরকারের সাহায্য প্রার্থনা পর্যন্ত করলেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। ডাল্‌হৌসি টললেন না। রানীর প্রার্থনা ও অনুরোধ দুই-ই তিনি অগ্রাহ্য করলেন।

যখন কিছুতেই কিছু হলো না, তখন বীরাংগনা বীরদর্পে কোম্পানীর প্রতিনিধিকে বললেন ঃ "মেরী ঝান্সি নেহি দেউঙ্গী"—আমার ঝাঁসি দেব না। স্তম্ভিত হ'লেন রেসিডেণ্ট রানীর এই দর্পিত উক্তিতে। কিন্তু ডাল্‌হৌসি এই স্পর্ধার জবাব দিলেন। কোম্পানীর সৈন্য ঝাঁসি অধিকার করলো। শক্তিশালী কোম্পানীর সংগে ক্ষুদ্র ঝাঁসি ত আর যুদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু লক্ষ্মীবাঈ এই অপমান ভুলতে পারলেন না। এর জ্বালা তুষের আগুনের মতো সারাক্ষণ দগ্ধ করতে লাগলো তাঁকে।

সেতারা ও ঝাঁসির পর ডাল্‌হৌসির লুব্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়লো নাগপুর রাজ্যের ওপর। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলের সংগে একটি সন্ধি করেন। সেই সন্ধিতে বলা হয়েছিলো যে, নাগপুর রাজ্য বংশানুক্রমে ভোঁসলে-বংশের অধীনেই থাকবে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় রঘুজী ভোঁসলে মারা গেলেন। রঘুজীর দুই স্ত্রী ছিলো। কিন্তু একজনেরও কোনো ছেলেপিলে হয়নি। বড় রানী একটি ছেলেকে দত্তক নিলেন। ডাল্‌হৌসি কিন্তু সেই দত্তক মঞ্জুর করলেন না। তার কারণও ছিলো। অনেক দিন থেকেই নাগপুর রাজ্যের দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন লোভীর মতো। তুলোর জন্যে নাগপুর

বিখ্যাত। ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে দৈত্যের মতো যে-সব কাপড়ের কল, তাদের খোরাক যোগাবে নাগপুর। নাগপুরের তূলো নামমাত্র দামে কিনে, তাই দিয়ে তৈরী কাপড় ভারতবর্ষে দশ গুণ দামে বিক্রী করতে পারলে কতো লাভ। বছরে যে কোটী কোটী টাকা চালান দেওয়া যাবে ইংলণ্ডে। কাজেই এই সুযোগ ডালহৌসি ছাড়লেন না। সংগে সংগে নাগপুর-রাজ্যও কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হ'য়ে গেলো।

ইংরেজের এই অবিচারে বিক্ষোভের ঢেউ বয়ে গেলো সারা দেশে। অসন্তোষ দেখা দিলো এখানে-ওখানে। সে-সব গ্রাহ্য করা ডালহৌসি প্রয়োজনই বোধ করলেন না। কোম্পানীর স্বার্থে এই বিশাল রাজ্যটি তিনি গ্রাস করলেন। শুধু তাই নয়। রঘুজীর বিধবা পত্নীকে জোর করে ধরে আনিয়ে তাঁকে দিয়ে রাজ্যের স্বত্ব ত্যাগ-পত্রে সই করিয়ে নিলেন তিনি। সেই সংগে নাগপুরের মারাঠী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে তাদের বদলে ইংরেজ সৈন্য আমদানী করা হলো। তারপর রাজার সব ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো একে একে। রাজকোষের মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত কিছুই থাকলো না। অন্তঃপুরে রানীদের বিছানার নীচে যে সোনারূপা ছিলো, তাও কেড়ে নেওয়া হলো। এইভাবে নাগপুর রাজ্য থেকে

কোম্পানীর কোষাগারে এলো পঁচাত্তর! লক্ষ টাকা।

সেতারা গেলো, ঝাঁসি গেলো, নাগপুরও গেলো।

এর পরেই ডালহৌসির দৃষ্টি পড়লো দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদের নিজামের রাজ্যের ওপর। নিজামের সংগে কোম্পানীর সন্ধি হয়েছিলো যে, তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত একদল ইংরেজ সৈন্যের খরচ যোগাবেন। এই বন্ধুত্ব রাখতে গিয়ে নিজামের প্রায় এক কোটী টাকা দেনা হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর পক্ষে দেনা শোধ দেওয়া কঠিন হ'য়ে পড়লো। তিনি দিশেহারা হ'য়ে গেলেন। সেই সুযোগে ডালহৌসি নিজামের জমিজমা গ্রাস করতে আরম্ভ করলেন। অনেক যুক্তি দেখালেন নিজাম, ন্যায় বিচার চাইলেন, বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন, সন্ধির কথা। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। হায়দরাবাদ চাই। কেন? বাঃ এই রাজ্যের বেরার প্রদেশেও যে প্রচুর তুলো জন্মায়, আর ইংরেজের স্বার্থে সেই তুলো হস্তগত করা যে একান্তই দরকার। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি একরকম জোর করেই বেরার-সমেত নিজামের রাজ্যের খানিকটা অংশ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করে নিলেন। দুর্বল নিজাম কিছুই করতে পারলেন না।

ডালহৌসি এইবার চোখ বুলোলেন ভারতবর্ষের মানচিত্রের গায়ে। দৃষ্টি গিয়ে পড়লো তাঞ্জোর রাজ্যের ওপর। এখানকার রাজা তখন শিবাজী। তিনি মারা গেলে তাঁর মেয়েরই সিংহাসন পাওয়ার কথা। ইংরেজ রেসিডেন্ট পর্যন্ত তা স্বীকার ক'রে লর্ড ডালহৌসিকে একখানা চিঠি লিখলেন। ডালহৌসি কিন্তু কিছুই শুনলেন না। তিনি তাঁর নীতি অনুযায়ী কাজ করলেন। তাঞ্জোর চলে গেলো কোম্পানীর মুঠোর মধ্যে।

বাজীরাও পেশোয়া অপুত্রক ছিলেন। তিনি দত্তক নিলেন নানাসাহেব বলে একটি ছেলেকে। সংগে সংগে কোম্পানীর দরবারে আদেশ করলেন সেই দত্তক অনুমোদন করবার জন্যে. আর তাঁকে পেশোয়া উপাধি ও বার্ষিক বৃত্তি দেবার জন্যে। বাজীরাও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নানা উপকার করেছিলেন। বিশেষ করে কাবুল-যুদ্ধ আর শিখ-যুদ্ধের সময়ে তাঁর বন্ধুত্বের জোরেই ইংরেজদের অনেক দুর্ভোগ কমে গিয়েছিলো। তিনি ভেবেছিলেন, কোম্পানী নিশ্চয়ই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবে। কিন্তু কোম্পানী বাজীরাওয়ের আবেদন অগ্রাহ্য করলো। তাঁর মৃত্যুর পরে নানাসাহেব যখন কোম্পানীর দরবারে তাঁর বাবার মতোই বছরে আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাবার

জন্যে আবেদন করলেন; ডালহৌসি তখন ছিঁড়ে ফেলে দিলেন সে আবেদন-পত্র।

এরপর এলো অযোধ্যার পালা। অযোধ্যার নবাব তখন স্মজাউদ্দৌলা। কোম্পানীর তিনি পরম বন্ধু। কিন্তু বন্ধু হলেও তাঁর ওপর কোম্পানীর সন্দেহ ঘোচে নি। নবাবের সংগে কোম্পানীর একটা সন্ধি হলো। সেই সন্ধির সর্ত ছিলো, নবাব পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশী সৈন্য তাঁর রাজ্যে রাখতে পারবেন না। কোম্পানীর সংগে এই বন্ধুত্বই নবাবের কাল হলো। বিরাট রাজ্য অযোধ্যা—কত দুর্গ, কত নগর, কত লোক। কাজেই কোম্পানী চাইলো অযোধ্যা অধিকার করতে। তখন অযোধ্যায় বর্গীর হাংগামা আরম্ভ হয়েছে। এই হাংগামা থেকে নবাবকে বাঁচাবার জন্যে কোম্পানী তাঁর সংগে আর একটা সন্ধি ক'রে চুনার দুর্গ আর এলাহাবাদের ভার নিলো। নবাব মারা যাবার পর অযোধ্যা রাজ্যের কিছু কিছু অংশ কোম্পানী ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগলো। তারপর লর্ড ডালহৌসি গোটা অযোধ্যা রাজ্যটাই গ্রাস করে বসলেন। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি। তাঁর অর্থে কোম্পানীর ধনাগার ভরে উঠ্‌লো। কিন্তু অযোধ্যার জনসাধারণের মন ভরে উঠ্‌লো অসন্তোষ আর বিদ্বেষে।

এইভাবে একে একে ছোট-বড় রাজ্যগুলো গ্রাস করেই ক্ষান্ত হলেন না ডালহৌসি। আরো নানাভাবে কোম্পানীর রাজ্য বিস্তার করতে লাগলেন তিনি, ধনরত্নে ভরিয়ে তুললেন কোম্পানীর কোষাগার। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভূমির বন্দোবস্ত, তালুকদারী-স্বত্ব লোপ, প্রজার ভূমি ক্রোক প্রভৃতি অন্যায় ব্যবস্থার ফলে ভারতের দিকে-দিকে অসন্তোষের সৃষ্টি হলো। কোম্পানীর কর্মচারীরা খুশি মতো জমির বন্দোবস্ত করতো। অনেক তালুকদার নিঃস্ব হয়ে পড়লো। অনেকেরই সম্পত্তি নীলামে বিক্রী হতে লাগলো—বংশানুক্রমে ভোগ-দখলের সম্পত্তি অনেকেরই হাত থেকে চলে যেতে লাগলো। মোগল আমল থেকে অনেকেই নিষ্কর জমি ভোগ করে আসছিলো। এসব জমিকে বলা হতো লাখেরাজ। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব লাখেরাজ জমির দলিল থাকতো না। যাদের ছিলো, তাদেরও পুরোনো দলিলপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কোম্পানীর কর্মচারীরা এর সুযোগ নিলো ষোল আনা। লাখেরাজ জমির মালিকদের তারা দলিল দেখাতে বললো। যারা দেখাতে পারলো না, তাদের জমি কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করে নিলো। অনেকেরই ভাগ্যে এইভাবে নিষ্কর জমি ভোগ করা ঘুচে গেলো। কোম্পানীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ আর উত্তেজনা বেড়েই চললো।

এইভাবে সারা দেশে সৃষ্টি হলো প্রবল অসন্তোষ। শুধু জনসাধারণের মধ্যে নয়, কোম্পানীর সিপাহীদের মধ্যেও কোম্পানীর ওপর বিরাগ জন্মাতে লাগলো। ভারতীয় সৈন্যেরা মাইনে পেতো খুব কম। কোম্পানীর জন্যে প্রাণ দিয়ে, কোম্পানীর রাজ্য বাড়িয়ে, তারা যা আশা করেছিলো তা পেলো না। রাওয়ালপিণ্ডিতে দুই দল সিপাহী কাজ করতো। একবার তারা মাইনে নিতে রাজী হলো না। তাদের মধ্যে চারজন সৈন্যকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো। সিপাহীদের মধ্যে দেখা দিলো বিষম চাঞ্চল্য। গোবিন্দগড়ের একদল সিপাহী দুর্গের দরজা পর্যন্ত আক্রমণ করলো। সংগে সংগে তাদের নিরস্ত্র করে তাদের জায়গায় মোতায়েন করা হলো একদল গুর্খা সৈন্য। সিপাহীরা ক্রমে বুঝলো যে, কোম্পানীর রাজ্যজয়ে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করে তাদের লাভ হয়নি কিছুই। কাজেই তাদের মধ্যেও বেড়ে চললো অসন্তোষ। এমন সময়ে বাধলো ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে যাবার জন্যে সিপাহীদের ওপর হুকুম এলো। সিপাহীরা বললো: যাবো না সমুদ্র-পারে।

ঠিক এই সময়ে একটা জনরব উঠলো যে, কোম্পানী নতুন ধরনের টোটা আমদানী করেছে। সেই টোটা নাকি গরু আর শূয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরি।

এই টোটা ব্যবহার করতে হিন্দু সিপাহীরা যেমন আপত্তি করলো, মুসলমান সিপাহীরাও তেমনি আপত্তি জানালো। তারা বললেঃ দাঁত দিয়ে এই টোটার টুপি ছিঁড়ে বন্দুকে ভ'রলে তাদের জাত-ধর্ম সব যাবে। সংগে সংগে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, ইংরেজ কোম্পানী তাদের বিষম শত্রু। তাদের দেশ নিয়েছে, এখন নষ্ট করতে চায় তাদের জাত-ধর্ম সব। এই ভাবেই সেদিন তৈরি হয়েছিলো ভারতব্যাপী সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিকা। ইংরেজের ইতিহাসে একে বলা হয়েছে বিদ্রোহ, কিন্তু আমরা জানি এই ছিলো আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রথম সংগ্রাম। এর দোষ ছিলো অনেক, ত্রুটিও ছিলো কম নয়। কিন্তু তবু আমাদের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অসাধারণ।





একশো বছর আগে বাংলা দেশে রাণীগঞ্জ, বহরমপুর আর বারাকপুরে একটা করে বড় সেনানিবাস ছিলো। বারাকপুরের সেনানিবাসে ছিলো চারদল ভারতীয় পদাতিক সৈন্য। জন, হিয়ার্সে এদের সেনাপতি ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় একদিন হঠাৎ দেখা গেলো বারাকপুরের টেলিগ্রাফ স্টেশনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বল্‌ছে। তারপর থেকে রোজই রাতে বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীদের খড়ের চালার

বাংলোগুলো পুড়ে পুড়ে ছাই হ'তে লাগলো। সাহেবরা ভাবলো, নিশ্চয়ই ভূতুড়ে ব্যাপার। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই খবর এলো, রাণীগঞ্জের ছাউনিতেও ঠিক ঐ রকম ব্যাপার ঘটছে। ভূতরা কি তবে খেলা-ধূলোর জন্যে সেনানিবাসগুলোই বেছে নিলো? সাহেবদের মনে একটু দুশ্চিন্তা দেখা দিলো।

চর্বির টোটা আমদানী করার পর থেকে দেশী সিপাহীদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিতে আরম্ভ হয়েছিলো, এই সময়ে তার ঢেউ এসে লাগলো বারাকপুর আর রাণীগঞ্জের সিপাহীদের মধ্যে। বহরমপুরের ছাউনিতে একজনও ইংরেজ সৈন্য ছিলো না, সবই ভারতীয় সৈন্য। কর্ণেল মিচেল ছিলেন সেখানকার সেনাপতি।

সিপাহীদের মধ্যে টোটা নিয়ে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে শুনে কার্ণেল মিচেলের খুব রাগ হলো। তিনি একদিন তাদের ডেকে বললেন, কোম্পানীর বিরুদ্ধে যারা বিক্ষোভ দেখাবে, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু মিচেলের এই কথায় সিপাহীদের মন শান্ত হলো না। বেড়েই চললো তাদের চাঞ্চল্য।

বাংলাদেশে তখন খুব বেশী ইংরেজ সৈন্য ছিলো না। কোম্পানী ভাবলো, এ ভালো কথা নয়। রেংগুন থেকে একদল ইংরেজ সৈন্য ক'লকাতায় আনা হলো।

সিপাহীরা ভাবলো, আমাদের অবিশ্বাস? এতে তাদের উত্তেজনা আরো বেড়ে গেলো। কোম্পানীর সাহেবদের হলো মহা দুশ্চিন্তা।

রোজ সকালে সিপাহীরা কুচ্‌কাওয়াজ করতো। একদিন কুচ্‌কাওয়াজের সময় হিয়ারসে তাদের উদ্দেশে এক লম্বা বক্তৃতা দিলেন। তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, এই নতুন টোটা ব্যবহার করলে হিন্দু কি মুসলমান কারোরই জাত বা ধর্ম নষ্ট হবার ভয় নেই। তিনি বললেন ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্দেশ্য সাধু, তাঁরা এই দেশের উন্নতি করতে চান; শাসন ও শৃংখলার ভালো বন্দোবস্ত ক'রে ভারতবাসীকে সভ্য ক'রে তোলাই তাঁদের ব্রত। কিন্তু শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভেজে? সিপাহীরা সন্তুষ্ট হলো না, ঘুচলো না তাদের ধর্মনাশের ভয়। তাদের সন্দেহ আর অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এক ছাউনি থেকে আরেক ছাউনিতে।

বহরমপুরের অবস্থা সংগীন হয়ে উঠ্‌লে কর্ণেল মিচেল সেখানকার সিপাহীদের নিরস্ত্র করলেন। তারপর তাদের নিয়ে চলে এলেন বারাকপুরে। কি জন্যে তাদের বারাকপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সিপাহীরা তা জানতেও পারলো না। কিন্তু পথে তারা কোন রকম অবাধ্যতা প্রকাশ করলো না।

ইতিমধ্যে বারাকপুরের ছাউনিতে এক কাণ্ড ঘটে গেলো।

বারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যে এক তরুণ সিপাহী ছিলো। অত্যন্ত সচ্চরিত্র। নাম মংগল পাঁড়ে। মংগল পাঁড়ে যখন শুনলো যে, ক'লকাতায় অনেক গোরা সৈন্য আমদানী করা হয়েছে, তখনই সে ভাবলো, দেশের সর্বনাশের সময় উপস্থিত হয়েছে। আর স্থির থাকতে পারলো না সে। একদিন সকালে কুচ্‌কাওয়াজের একটু আগেই সে ছাউনি থেকে বের হলো। তার হাতে গুলি-ভরা পিস্তল, কোমরে তলোয়ার। আর ত'র দুই চোখে জ্বলছে দেশপ্রেমের আগুন। মংগল পাঁড়ে ছাউনির খোলা উঠানে এসে দাঁড়িয়ে আর সব সিপাহীদের ডাক দিলো—বল্‌লো ঃ এই আমাদের বাঁচবার পথ, এসো, আমরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি।

বিদ্রোহ!

তিনটি অক্ষরের এই কথাটি তীরের মতো গিয়ে বিঁধলো সিপাহীদের মনে। নিমেষের মধ্যে তাদের চিন্তাতেও ছড়িয়ে পড়লো এর জ্বালা।

সে-দিনটা ছিলো রবিবার। সকলের বিশ্রামের দিন। খবর পেয়ে বগ্‌ নামে এক ইংরেজ সৈনিক-কর্মচারী তলোয়ার আর পিস্তল নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে তখনি

সেখানে উপস্থিত হলো। মংগল পাঁড়ে গুলি ছুঁড়লো তাকে লক্ষ্য ক'রে। দৈবচক্রে ভুল হলো তার নিশানা, গুলি বগের গায়ে না লেগে লাগলো তার ঘোড়ার গায়ে। ঘোড়াটা তখুনি পড়ে গেলো। বগ্ও তাড়াতাড়ি উঠে মংগল পাঁড়ের দিকে গুলি ছুঁড়লো। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। বগ্ তখন তলোয়ার ধরলো। এইসব গোলমাল শুনে আরেকজন ইংরেজ সৈনিক ছুটে এলো সেখানে। সেও তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করলো মংগল পাঁড়েকে। তখন একদিকে মংগল পাঁড়ে, আর অপর দিকে দুই ইংরেজ সৈন্য। ছাউনির আর সব সিপাহীরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখছিলো এই কাণ্ড।

মংগল পাঁড়ের হৃদয়ে তখনি জেগে উঠেছে অমিত সাহস আর দুর্জয় সংকল্প। গোরা সৈন্য দুজন তার গতি রোধ করতে পারলো না, পারলো না তারা তার আক্রমণ রুখ্তে। তরুণ বিদ্রোহী সিপাহীর নিপুণ হাতের চালনায় তলোয়ারখানা ঘুর্তে লাগলো বিদ্যুৎবেগে। কী ক্ষিপ্র সেই অসি-চালনা। ইংরেজ সৈনিক দুজনের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলো সেই তলোয়ারের ভীম আঘাতে। এই সময়ে একজন মুসলমান সিপাহী এসে মংগল পাঁড়েকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। ইংরেজ দুজন প্রাণে বেঁচে গেলো।

দুরে একদল সিপাহী দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের কেউ যোগ না দেওয়ার জন্যে মংগল পাঁড়ে তাদের ভীরু, কাপুরুষ ও দেশদ্রোহী বলে তিরস্কার করতে লাগলো। আরেক দিকে পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিলো কুড়িজন সিপাহী আর একজন স্থবাদার। তারাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। মংগল পাঁড়ে তাদেরও ধিক্কার দিলো। তারা কেউ পাঁড়েকে একটি কথাও বললো না। মংগল কিন্তু প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেলো না, দাঁড়িয়ে থাকলো সেখানেই। যখন দেখলো যে, অন্য সিপাহীরা কিছুতেই যোগ দিলো না তার সংগে, তখন সে নিজেই নিজেকে গুলি করলো আর সংগে সংগে পড়ে গেলো অজ্ঞান হয়ে।

এমন একটা ব্যাপার নিমেষের মধ্যে ঘটে যাওয়ায় ছাউনির ইংরেজ সেনাপতি কম বিস্মিত হলেন না। তিনি ভাবলেন, নিরপেক্ষ সিপাহীদের হাতেও অস্ত্র রাখা নিরাপদ নয়। আজ এরা নিরপেক্ষ আছে, কাল হয়ত এরাই তলোয়ার উঁচিয়ে আসবে। সেইসব নিরপেক্ষ সিপাহীদের নিরস্ত্র করার জন্যে তখনি তাদের আদেশ দেওয়া হলো কুচ্ কাওয়াজ করে সমবেত হতে। ছাউনির মাঠে সারি সারি কামান সাজিয়ে রাখা হলো আর বারাকপুর সেনানিবাসে যত ইংরেজ সৈন্য ছিলো, অস্ত্রশস্ত্রে স্মসজ্জিত হয়ে সবাই সেখানে এসে দাঁড়ালো। সিপাহীরা সেইখানে এসে সারিবন্দী হয়ে

দাঁড়ালো। সেনাপতি হুকুম দিলেন: সবাই অস্ত্র পরিত্যাগ কর। অমনি সিপাহীরা নীরবে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করলো। তখন তাদের জানিয়ে দেওয়া হলো, তারা আর কোম্পানীর সামরিক বিভাগের কর্মচারী নয়। যে-সব সিপাহী তখনও পর্যন্ত প্রভুভক্ত ছিলো, ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হৃদয়ে তারা তাকিয়ে দেখলো এই দৃশ্য।

অদূরে শোনা গেলো ভাবী বিপ্লবের পদধ্বনি। কোম্পানীর ইংরেজ সেনাপতিরা সেদিন বুঝতে পারেনি কালো সংকেত। তারা ভেবেছিলো সিপাহীদের নিরস্ত্র ক'রলেই বুঝি এই বিদ্রোহ অংকুরে বিনষ্ট হবে। সে-ভুল যখন ভাঙলো তাদের, তখন সারা হিন্দুস্থান জুড়ে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে।

মংগল পাঁড়ে ভীষণ ভাবেই আহত হয়েছিলো, তার বাঁচার কোন আশাই ছিলো না। সেই অবস্থায় তাকে ফাঁসী দেওয়া হলো। সেই তরুণ সৈনিক, সেই বীর যুবক আহত অবস্থাতেই ধীরভাবে ফাঁসীর দড়িতে মাথা বাড়িয়ে দিলো। আর যে-সুবাদার আহত ইংরেজ সৈনিক-দুজনকে সাহায্য করেনি, বিচারে তারও ফাঁসী হলো।

এমনি ভাবে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ হলো মংগল পাঁড়ে।

আম্বালা। পাঞ্জাবের একটা বড় সেনানিবাস। এখানেও সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ও আশংকার সৃষ্টি হয়েছিলো। আম্বালা সেনানিবাসের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল এ্যানসন্। তিনি সিপাহীদের আনুগত্য লাভের জন্যে একদিন খুব জোর গলায় তাদের সামনে বক্তৃতা করলেন। কিন্তু শান্ত হলো না সিপাহীরা। এখানেও অসন্তোষের সেই একই কারণ—টোটা। সিপাহীরা কিছুতেই ব্যবহার ক'রবে না এই নতুন টোটা। প্রধান সেনাপতিও তাদের বাধ্য করতে চাইলেন সেই টোটা ব্যবহার করতে—নইলে কোম্পানীর ইজ্জত যায়। এর ফলে আম্বালাতেও বারাকপুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগলো। প্রতিদিন রাত্রে এখানেও ইংরেজ শিবিরে, সিপাহীদের ছাউনিতে আর মাল-গুদামে অগ্নি-কাণ্ড হতে লাগলো। তীব্র হয়ে উঠ্‌লো অসন্তোষ।

মীরাট। উত্তর প্রদেশের মস্ত বড় একটি সেনা-নিবাস এখানে—ভারতের অন্যতম প্রধান সেনানিবাসও এই মীরাট। এখানকার সেনাপতি জেনারেল হিউয়েট। এখানেও দেখা দিলো তীব্র অসন্তোষ। মীরাটে তখন প্রায় দু'হাজার ইংরেজ সৈন্য আর তিন হাজার ভারতীয় সৈন্য ছিলো। নতুন টোটা তৈরির প্রধান কারখানাটা তখন এইখানেই। কাজেই সবাই তাকিয়েছিলো মীরাটের দিকে। মীরাটের সিপাহীরা কি করে—এই

চিন্তাই সেদিন করছিলো ভারতের অন্যান্য সেনা-নিবাসের সিপাহীরা ব্যাকুলভাবে।

মীরাটের অশ্বারোহী দলের সেনাপতি ছিলেন কার্ণেল স্মিথ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে একদিন কার্ণেল স্মিথ অশ্বারোহীদলের পঁচাশীজন সিপাহীকে আদেশ দিলেন নতুন টোটা ব্যবহার করতে। সিপাহীরা কার্ণেলের আদেশ অমান্য করলো—টোটা তারা স্পর্শ করবে না। মীরাটের এই বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো অযোধ্যায়। ক্রমে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যেও দেখা দিলো তীব্র অসন্তোষ।

অযোধ্যার অসন্তোষের অন্য কারণও ছিলো। অযোধ্যা অধিকার করার সময় কোম্পানী এখানকার অনেক প্রাচীন অট্টালিকা ভেঙে ফেলেছিলো, বন্দী করেছিলো নবাবকে, আর ধর্ম্মমন্দিরগুলো অধিকার করে নিয়েছিলো সরকারের সম্পত্তি বলে। তার ওপর, জনসাধারণকে পীড়ন করে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছিলো উচ্চ হারে। অনেক তালুকদার সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। কাজেই অযোধ্যার সমস্ত লোকই কোম্পানীর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলো। এর ফলেই তাদের মনের মধ্যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে জন্মালো প্রবল উত্তেজনা।

মীরাটের অশ্বারোহী সিপাহীদের অবাধ্যতার সংবাদ পেয়ে সেনাপতি হিউয়েট উৎকণ্ঠিত হ'লেন—তিনি কারণ অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন। জানা গেলো যে, সিপাহীরা নতুন টোটা স্পর্শও করেনি। সামরিক বিচার হলো আর পঁচাশীজনের প্রত্যেকের হলো দশ বছর কারে সশ্রম কারাদণ্ড। বিচার হলো, দণ্ড হলো, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত মীরাটের বাইরের লোক এই খবর জানতেও পারেনি। ফলে, জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ বেড়ে চললো। মীরাটের এই ব্যাপার ঘটলো ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে। এই ঘটনার পরের দিনই মীরাটে জ্বলে উঠ্‌লো বিদ্রোহের আগুন।

ইতিমধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো ব্যারাকপুরের খবর। সেখানকার সেনানিবাসের সিপাহীদের অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের সামরিক বিভাগ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—এই সংবাদ ভারতের সব সেনানিবাসে পৌঁছে গেলো আর সংগে সংগে সৃষ্টি হলো প্রবল উত্তেজনা আর সন্দেহ। উত্তেজনা দেখা দিলো সিপাহীদের মধ্যে, দেখা দিলো জনসাধারণের মধ্যে। উত্তেজনা আর সন্দেহে—আশংকা আর সংশয়ে ভারী হয়ে উঠ্‌লো ভারতের আকাশ-বাতাস।

এই বিষ-বাষ্প থেকেই জন্ম নিলো বিদ্রোহ।

লক্ষ্ণৌ থেকে সাত মাইল দূরে, অযোধ্যার সেনা-নিবাসে ছিলো একদল সিপাহী। তারাও অসম্মত হলো এই নতুন টোটা ব্যবহার ক'রতে। মংগল পাঁড়ের জীবন-উৎসর্গ বৃথা হয়নি। সে রেখে গিয়েছিলো এমনই একটি প্রেরণা, এমনই একটা আদর্শ—যা সকল সিপাহীকে বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলো। লক্ষ্ণৌ সেনানিবাসের সেনাপতি ছিলেন স্যর হেনরী লরেন্স। অযোধ্যার সিপাহীদের আদেশ অমান্য করার সংবাদ পেয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে বের হলেন সন্ধ্যার অন্ধকারে বহু সৈন্য আর কামান নিয়ে। তিন ঘণ্টায় সাত মাইল পথ অতিক্রম করলেন স্যর হেনরী লরেন্স। এসে হাজির হলেন সিপাহীদের ছাউনিতে। চমকে উঠ্লো সিপাহীরা। সশস্ত্র ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্য, বহু সশস্ত্র পদাতিক সৈন্য আর কামান দেখেই তাদের বুঝতে দেরী হলো না যে, লরেন্সের এই অতর্কিত নৈশ অভিযান শুধু তাদের সায়েস্তা করবার জন্যেই।

লরেন্স এসে হুকুম দিলেন: অস্ত্র ত্যাগ কর।

অযোধ্যার সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হলো।

সংগে সংগে বসলো সামরিক আদালত। বিচারে পঞ্চাশজন সিপাহীর বিরুদ্ধে আনা হলো ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। তাদের প্রত্যেককে দশ বছর করে সশ্রম

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। বাকী সিপাহীদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো সামরিক বিভাগ থেকে।

এইভাবেই সেদিন তৈরি হয়েছিলো বিদ্রোহের ক্ষেত্র। সেই সর্বনেশে টোটা আমদানী করার সংগে সংগে জেগে উঠ্‌লো সারা ভারত, জেগে উঠ্‌লো ভারতের বিদ্রোহী নওজোয়ান—পলাশি-যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পরে।





তিন

দেখতে দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। মীরাট থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে কানপুর, কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ থেকে এলাহাবাদ— ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই সিপাহীদের মধ্যে দেখা দিলো কোম্পানী-বিদ্বেষ প্রচণ্ডভাবে। এমন ব্যাপক বিস্ফোরণ যে হ'তে পারে, কোম্পানীর সরকার তা অনুমান ক'রতেও পারেনি। সে সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড ক্যানিং। এই সময়ে চীনে গোল-

মাল দেখা দিয়েছিলো, আর সেখানে শৃংখলা রক্ষার জন্যে পাঠান হয়েছিলো একদল সৈন্য। 'কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতের সৈন্যদলের মধ্যে এই অসন্তোষ লক্ষ্য ক'রে লর্ড ক্যানিং বুঝলেন দেশের অবস্থা মোটেই নিরাপদ নয়। তিনি মাঝ-পথ থেকে চীন-যাত্রী সৈন্যদের তখনি ফিরিয়ে আনালেন ভারতবর্ষে'। কিন্তু গোরা সৈন্য আরো দরকার। বোম্বাই সেনানিবাস থেকে যে-সব ইংরেজ সৈন্য তখন পারস্যে গিয়েছিলো, তাদের ফিরিয়ে আনা হলো এদেশে। বিদ্রোহ ইতিমধ্যে ধূমায়িত অবস্থা থেকে প্রজ্বলিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

১০ই মে, সকালবেলা। মীরাট।

দেখা গেলো সাহেব অফিসারদের বাংলোয় কোনো দেশী চাকর কাজ ক'রতে আসেনি। শহরে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। কোম্পানীর নির্মম ব্যবহারে মীরাটের সেনানিবাসের অন্য সিপাহীরা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলো। ভৃত্যদের অনুপস্থিতি সাহেবদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করলো। সেই সংগে একটু আতংকেরও। সামান্য নেটিভ চাকর—তারাও এক-যোগে এইভাবে নিয়মভংগ করলো। দিন কেটে গেলো। সন্ধ্যা হয়েছে। হঠাৎ ভেরী আর বন্দুকের শব্দ আর ক্ষিপ্ত জনতার ভৈরব কোলাহল কাঁপিয়ে তুললো মীরাটের আকাশ-বাতাস। উন্মত্ত সিপাহীর দল

প্রথমেই ভেঙে ফেললো জেলখানার ফটক। তারা মুক্ত করে দিলো সেই পঁচাশীজন দণ্ডিত সিপাহীকে।

ইংরেজ সেনাদের ছাউনি ছিলো দেশীয় সেনাদের ছাউনি থেকে কিছু দূরে। তাই সিপাহীদের এই উত্তেজনা আর উন্মাদনার ব্যাপারটা ইংরেজরা প্রথমে জানতে পারেনি। মীরাটে ভীষণ বিপ্লব আরম্ভ হলো। এই বিপ্লবে হিন্দু আর মুসলমান এক-মন আর এক-প্রাণ হয়েই দাঁড়ালো কোম্পানীর বিরুদ্ধে। প্রায় সব সিপাহী-ই যোগ দিয়েছিলো এ-বিপ্লবে। ইংরেজ সেনা-নিবাসে দেখা দিলো ভীষণ আতংক। যত কাপ্তেন আর মেজরের দল সবাই প্রমাদ গুণলো। তাদের সামনে দেখা দিলো দুটো সমস্যা, আত্মরক্ষা আর স্ত্রীপুত্রদের রক্ষা করা আর স্বজাতীয় সেনাদের মধ্যে শৃংখলা ও সাহস বজায় রাখা। এই দুই সমস্যায় তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ত সিপাহীদের গুলির আঘাতে অনেক ইংরেজ মারা গেছে। ভয় পেয়ে অনেকেই আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আত্মগোপন করবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো।

দণ্ডিত সিপাহীদের কারামুক্ত করে বিদ্রোহীরা হানা দিলো ইংরেজদের ছাউনিতে। হাতে তাদের জ্বলন্ত মশাল। সেই মশালের অগ্নিশিখায় বিপ্লব দেখা দিলো

ভৈরব মূর্তিতে। দেখতে দেখতে ইংরেজদের আবাস-গৃহগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌লো। " রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে বয়ে চ'ল্‌লো রক্তের স্রোত। বিপন্ন ইংরেজরা স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। কাপ্তেন ক্রেগী, তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকটি মহিলাকে নিয়ে কালো কাপড়ে গা ঢাকা দিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এক জীর্ণ মন্দিরে।

প্রায় সারা রাত ধরে চ'ল্‌লো হত্যা, গৃহদাহ আর লুঠ-পাট। সিপাহীদের সংগে ততক্ষণে যোগ দিয়েছিলো দলে দলে সাধারণ মানুষ।

ছিন্ন-শির ইংরেজের মৃতদেহে ঢেকে গেলো মীরাটের পথ।

রাত শেষ হয়ে এলো। উন্মত্ত জনসাধারণ ও সিপাহীরা যে যেখানে পারলো আত্মগোপন করলো। যে-সব ইংরেজ পালিয়েছিলো, দিনের বেলায় তারা ধীরে ধীরে মাথা তুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তাদের দৃষ্টিতে পড়লো বিভীষিকাময় দৃশ্য। পথের ওপর, ছাউনির মাঠে তাদের অগণিত বন্ধু-বান্ধবের মৃতদেহ। আবাসগৃহ সব ভস্মস্তূপে পরিণত হ'য়েছে। প্রতিহিংসায় ইংরেজদের শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌লো।

মীরাট থেকে ক্ষিপ্ত সিপাহীরা ছুট্‌লো দিল্লীর দিকে। দিল্লী, চলো দিল্লী।

তখনো দিল্লীর সিংহাসনে মোগল সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্। তখনো দিল্লী মোগলের রাজধানী। সেই রাজধানী লক্ষ্য করে ছুট্‌লো বিদ্রোহী সিপাহীরা বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে। এদিকে মীরাট সেনা-নিবাসের অবশিষ্ট ইংরেজরা তাদের লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে দেখে ছাউনিতে একটা সিপাহীও নেই। তারা ছুট্‌লো শহরের দিকে। দোকানদার ও শহরের অনেক নিরীহ লোককে বিদ্রোহী সন্দেহ করে তাদের ধরে ধরে ফাঁসী দিতে আরম্ভ করলো। কাউকে বা মারতে লাগলো গুলি করে। রাতে যারা প্রাণের ভয়ে পালিয়েছিলো, এখন দিনের বেলায় সিপাহীদের অনুপস্থিতিতে বীর সেজে, তারাই চালাতে লাগলো এই অবাধ হত্যাকাণ্ড শুধু সন্দেহের বশীভূত হয়ে।

দিল্লীতে বেজে উঠ্‌লো বিদ্রোহের ভেরী।

পলাশি-যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের ওপর তাদের শাসন বিস্তার করলো, যখন সত্যিই বণিকের হাতের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দিলো, তখন মোগল বাদশাহের সাধের দিল্লীর অধঃপতন শুরু হয়েছে। ইতিহাসের নিয়মই এই। বাদশাহ্ শাহ্ আলম দিন কাটাচ্ছিলেন কোম্পানীর কাছ থেকে বছরে দশ লক্ষ টাকা বৃত্তি নিয়ে। এই শাহ আলমই কোম্পানীকে বাংলা, বিহার

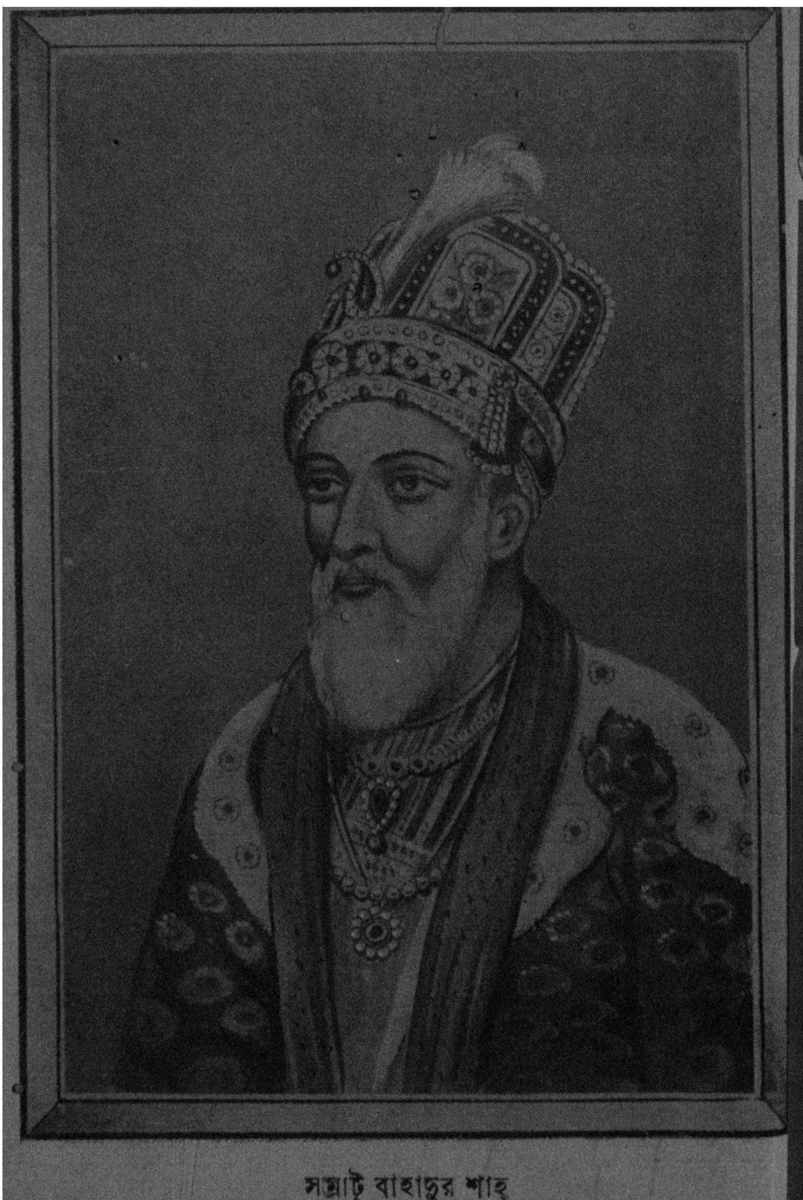
ও উড়িষ্যার দেওয়ানী দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আকবর শাহের সময়েও বাদশাহী হুকুম ছাড়া কোম্পানী কোনো নতুন সুবাহ্ (প্রদেশ) অধিকার করতে পারতো না। তখনো ইংরেজ রেসিডেণ্টকে খালি পায়ে সেলাম করতে করতে বাদশাহের দরবারে আসতে হতো। তখনো বাদশাহের নামই ছাপা হতো মুদ্রার ওপর। কোম্পানী সময় ও সুযোগ বুঝে একে একে তাঁর সম্মান-চিহ্নগুলো লোপ করতে লাগলো। এমনি করে আশী বছর কেটে গেলো পলাশি যুদ্ধের পর। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে দিল্লীশ্বর বঞ্চিত হলেন সব রাজ-লক্ষণ থেকে। সামান্য বন্দীর মতো তিনি বাস করতে লাগলেন রাজপ্রাসাদে। যে টাকা বৃত্তি পান, তা' দিয়ে বাদশাহের দিন চলে না, বজায় রাখা যায় না বাদশাহী ঠাট। দারিদ্র্যের কবলে পড়লেন আকবর শাহ্। কোম্পানীর দরবারে কতো আবেদন-নিবেদন করলেন তিনি বার্ষিক বৃত্তি বাড়াবার জন্যে। কিন্তু কোম্পানী তাঁর কথায় কান দিলো না। যে-বাদশাহের দরবারে ইংরেজ একদিন নগ্ন-পদে আর নত-মস্তকে প্রবেশ করতো, আজ সেই ইংরেজ প্রত্যাখ্যান করলো বাদশাহের আবেদন।

আর কোনো উপায় না দেখে, আকবর শাহ্ ঠিক করলেন ইংলণ্ডে দরবার করবেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর আসল মালিকেরা তখন বাস করতো লণ্ডনে। বাদশাহ্ একজন দূত পাঠালেন। যাঁকে তিনি এত বড় কাজের ভার দিয়ে ইংলণ্ডে পাঠালেন, তিনি কে জান? তিনি বাংলার এক শ্রেষ্ঠ সন্তান, রামমোহন রায়। বিলেত যাওয়ার আগে সম্রাট্ আকবর শাহ্ 'রাজা' উপাধি দিলেন রামমোহনকে। রাজা খুব যোগ্যতার সংগেই বাদশাহের আবেদন কোম্পানীর দরবারে উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। কোম্পানীর ডিরেক্টররা কোনো কথাই শুনলেন না। আকবর শাহ্ মারা গেলেন। সম্রাট্ হলেন তাঁর ছেলে বাহাদুর শাহ্। নামেই সম্রাট্। কেন না, বাহাদুর শাহ্ যখন দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন, তখন কোম্পানী প্রায় সারা ভারতবর্ষেরই মালিক হয়ে বসেছে ছলে, বলে আর কৌশলে। বাহাদুর শাহ্ সম্রাট্ হবার সংগে সংগে কোম্পানী ঠিক করলো যে দিল্লীর বাদশাহের উত্তরাধিকারীর চিরন্তন স্বত্ব লোপ পাবে; তা'ছাড়া সম্রাট্ পদবীও দেওয়া হবে না আর কাউকে। কোম্পানীকে আশ্রয় দিয়ে, কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ দান করে, দিল্লীর বাদশাহ্ শেষে এই পুরস্কার লাভ করলেন। মোগল-মহিমা একেবারে পথের ধুলোয় মিশে গেলো। দিল্লীর জনসাধারণ ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল

হয়ে উঠ্‌লো। রাজধানী দিল্লীর আবহাওয়া জনসাধারণের বিক্ষোভে যখন এইভাবে ভারী হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে, সেই উত্তেজনার মুহূর্তে দিল্লীর সীমান্তে ধ্বনিত হলো মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীদের জয়ধ্বনি।

১০ই মে সন্ধ্যাবেলায় মীরাটের হত্যাকাণ্ডের পর যাত্রা করেছিলো অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহীরা দিল্লীর দিকে। ১১ই মে সকালবেলায় যমুনার সেতু পার হয়ে তারা প্রবেশ করলো দিল্লীতে। মীরাট থেকে দিল্লী পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার ছিলো। বিদ্রোহীরা মীরাট ত্যাগের আগেই সে-সব তার কেটে দিয়েছিলো। দিল্লীর ইংরেজরা তাই মীরাটের হত্যাকাণ্ডের কোনো খবরই জানতে পারেনি। বিদ্রোহী সিপাহীদের দিল্লী আসার সংগে সংগে দিল্লীর আবহাওয়া উত্তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। রাজধানীর বহু মুসলমান জনসাধারণ আর সম্ভ্রান্ত অধিবাসী যোগ দিলো এই সিপাহীদের দলে। দিল্লীর সেনানিবাসের সিপাহীদের মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো—তারাও নেচে উঠ্‌লো বিদ্রোহের তরংগে। হঠাৎ দিল্লীর বুকে যেন নামলো উত্তেজনার উন্মত্ততা। সে কি অভূতপূর্ব উন্মাদনা! চারিদিকে কোলাহল, চারিদিকে প্রমত্ত সিপাহীদের কণ্ঠে রণহুংকার। অশ্বের ক্ষুরে দিল্লীর রাজপথ ঢেকে গেলো ধূলোয়। অনেক অধিবাসী ভয় পেয়ে আত্মগোপন



সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্

করলো, বাজারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেলো। সারা শহর থমথম্ করতে লাগলো আতংক আর উত্তেজনায়। দিল্লীর সেনানিবাসে তখন ছিলো সাড়ে তিন হাজার ইংরেজ সৈন্য আর বাহান্ন জন উর্ধ্বতন কর্মচারী। শহরের চারদিকেই সুদৃঢ় প্রাচীর আর প্রশস্ত ও গভীর পরিখা। নগরে প্রবেশ করবার ছিলো আটটি তোরণ। উত্তেজিত সিপাহীর দল সেই সব তোরণ দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে করতে পথের যেখানে ইংরেজ দেখতে পেলো, তাদেরই হত্যা করলো, কারো বা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলো। ঝড়ের বেগে তারা যেন ঢুকলো শহরে। তাদের গতিরোধ করে কার সাধ্য। এমন আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিতভাবে তারা হানা দিলো যে দিল্লীর ইংরেজ সৈন্যরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো। সিপাহীদের কণ্ঠে রণ-গর্জন—সে গর্জনে চমকিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো দিল্লীর অধিবাসীরা। তারাও উন্মত্ত হয়ে তাদের সংগে যোগ দিলো। টলমল করে ওঠে দিল্লী—টলমল করে ওঠে কোম্পানীর শাসন।

সিপাহীরা এলো রাজপ্রাসাদে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে। এলো তারা ভারতের স্বাধীনতার দাবী কণ্ঠে নিয়ে। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের কাছে এসে তারা আনুগত্যের শপথ নিলো। ঘোষণা করলো তাঁকে

ভারতের সম্রাট্ বলে। আর চাইলো তাঁর সাহায্য, তাঁর সহযোগিতা।

বাহাদুর শাহ সাহায্য করলেন না। পরামর্শ করলেন ক্যাপ্টেন ডাগ্‌লাস আর কমিশনার ফ্রেজার-সাহেবের সংগে। ডাগ্‌লাস ছিলেন প্রাসাদ-রক্ষী সৈনিকদের অধ্যক্ষ। কিন্তু প্রাসাদ-রক্ষী সৈন্যরা বেঁকে দাঁড়ালো—যোগ দিলো তারা বিদ্রোহীদের সংগে। ইংরেজ অধ্যক্ষের হুকুম তারা মানলো না। অবস্থা বেগতিক দেখে ফ্রেজার সাহেব গেলেন পালিয়ে। বীর ডাগ্‌লাস প্রাসাদের পরিখার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আহত হয়ে আত্মগোপন আর আত্মরক্ষা করলেন। তারপর রাতের অন্ধকারে অতিকষ্টে তিনি স্বগৃহে ফিরে গেলেন। উন্মত্ত সিপাহীরা ধাওয়া করলো সেখানেও। ডাগ্‌লাসের বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই তারা বধ করলো ফ্রেজারকে, তারপর উপরে উঠে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলো। ঘরের মধ্যে ছিলেন ডাগ্‌লাস, হাচিন্‌সন, এক পাদ্রী সাহেব আর কয়েকজন ইংরেজ মহিলা ; কেউই পরিত্রাণ পেলো না। সেখান থেকে তারা ছুট্‌লো দরিয়াগঞ্জে। এই অঞ্চলে বাস করতো ব্যবসায়ী ইংরেজরা। বেলা দু'টোর মধ্যেই দরিয়াগঞ্জের বেশীর ভাগ ইংরেজ নর-নারী নিহত হলো।

সিপাহীরা এবার লুঠ করলো তোষাখানা। এটাই ছিলো ইংরেজদের ব্যাংক। একটি কর্মচারীও বাঁচলো না। শহরে যেখানে যত খৃস্টান ছিলো সবাইকে ধরে ধরে কেটে ফেললো সিপাহীরা, কাউকে বা গুলি করে মারলো। তাদের সম্পত্তি লুঠ করলো, আগুন লাগিয়ে দিলো ঘরে।

কাশ্মীর গেট—দিল্লী-প্রবেশের অন্যতম তোরণ। ব্রিগেডিয়ার গ্রেবস্ কর্ণেল রিপ্লের অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। পথে যেতে যেতেই দিল্লীর সিপাহীদের সংগে দেখা হলো মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীদের। অমনি বন্দুকের সঙীন উল্টো দিকে ঘুরে গেলো। কর্ণেল রিপ্লে ও চারজন ইংরেজ সৈন্য নিহত হলেন সেইখানে। এলেন মেজর আবট্, মেজর পিটার্সন, আরো সিপাহী, আরো কামান নিয়ে। কিন্তু কাশ্মীর-তোরণে তখন একটি বিদ্রোহী সিপাহীও ছিলো না। এদিকে নগরের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা ইংরেজ সেনাপতিরা জানতেই পারলেন না।

দিন গেলো, সন্ধ্যা হয়ে এলো।

কাশ্মীর তোরণে বসে ইংরেজ সেনাপতিরা প্রতীক্ষা করছেন বিপক্ষের আক্রমণ। এমন সময় সমস্ত নগর কাঁপিয়ে উঠ্‌লো এক ভীষণ শব্দ। সংগে সংগে ধোঁয়া আর আগুনের শিখায় ছেয়ে গেলো দিল্লীর

আকাশ। ব্যাপার কী? পাছে অস্ত্রাগার বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায় সেই আশংকায় নিরুপায় ইংরেজরা বারুদ-ঘরে আগুন ধরিয়ে উড়িয়ে দিলো অস্ত্রাগার। এই বিস্ফোরণের ফলে চার-পাঁচজন ইংরেজ মরলো আর চার-পাঁচশো লোক মরলো শহরের ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায়। তারপর যেখানে যত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা ছিলো, প্রাণের ভয়ে সবাই সেনানিবাসের কাছাকাছি গোলঘরে এসে আশ্রয় নিলো। দারুণ গরমে এই অতি সংকীর্ণ গৃহে আবদ্ধ থেকে তাদের হলো চরম দুর্গতি।

ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর-তোরণ রক্ষা করতে পারলো না। বিদ্রোহী সিপাহীদের গুলির মুখে মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্য আর কতক্ষণ যুদ্ধ করবে? আত্মরক্ষার শেষ ঘাঁটিটি চলে গেলো দেখে ব্রিগেডিয়ার গ্রেব্স্ আদেশ দিলেন ইংরেজ নরনারীদের দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে যেতে। পাঁচদিনের দিন দিল্লী শহরে কিংবা দিল্লীর সেনানিবাসে আর একটিও ইংরেজ রইলো না। বিদ্রোহীদের আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে ইংরেজ সৈন্যরা যে যেখানে পারলো পালিয়ে বাঁচলো।





চার

মীরাট ও দিল্লীর খবর পৌঁছলো ক'লকাতায়। ইংরেজ ও ফিরিংগী মহলে দেখা দিলো আতংক।

টনক নড়লো বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর। বিদ্রোহকে সংযত করার জন্যে তিনি এক নতুন আইন জারি করলেন ঃ যে-কোন লোক কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ করবে, এই আইনের বলে বিনা উকিলেই তার অপরাধের বিচার হবে: ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশন বা কমিশনার এই বিচার করবেন। তাঁরাই অপরাধীকে

প্রাণদণ্ড, নির্বাসন বা কারাদণ্ড দিতে পারবেন এবং এই বিচারের ওপর আর কোর্টে আপীল চলবে না।

ক্যানিং এর এই আইন ভারতের জনসাধারণের মনে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার করলো। কোম্পানীর ন্যায়-বিচারের ওপর আস্থা হারালো তারা।

আম্বালার সেনানিবাসের ইংরেজদের মধ্যেও দেখা দিলো ভয়। সেখানে একদিন খবর এলো যে মুসৌরীর গুর্খাসৈন্যদল প্রধান সেনাপতির আদেশ অমান্য করেছে, লুঠ করেছে তাঁর জিনিসপত্র। সেই বিদ্রোহী গুর্খাবাহিনী সিমলায় হানা দেবার আয়োজন করেছে। এ খবরে সিমলার শৈল-নিবাসের ইংরেজ মহলেও আতংকের সঞ্চার হলো। চারদিকে তারা দেখতে লাগলো শুধু বিপ্লবের করালমূর্তি। গুর্খা-সৈন্যদের বিদ্রোহের অবশ্য অন্য কারণও ছিলো--তারা উত্তেজিত হয়েছিলো মাইনে পায়নি বলে।

সিপাহীরা দিল্লী অবরোধ করে রইলো। প্রধান সেনাপতি ও বড়লাটের মধ্যে পরামর্শ হলো বিদ্রোহী-দের হাত থেকে কি করে দিল্লী উদ্ধার করা যায়। কোম্পানীর অনুগ্রহপ্রার্থী দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ও প্রতিপত্তি-শালী বহু ধনী লোক সর্বস্ব দিয়ে কোম্পানীকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। পাতিয়ালা, ঝিন্দ্, নাভার রাজারা আর কর্ণালের নবাব এগিয়ে এলেন

কোম্পানীকে সাহায্য করতে। এইসব রাজা আর নবাবদের অনেক সৈন্য ছিলো। নানা জায়গায় সেই সৈন্যদের সমবেত করা হলো। ফলে, সেই সব অঞ্চলের উত্তেজিত জনসাধারণ শান্ত হলো; বিক্ষোভ প্রদর্শনে বিরত থাকলো।

২৫শে মে।

আম্বালা থেকে প্রধান সেনাপতি আন্‌সন্‌ সসৈন্যে যাত্রা করলেন দিল্লীর দিকে।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস, পরের দিনই ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তিনি। মরবার আগে তিনি সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়ে গেলেন সেনাপতি বার্ণার্ডের ওপর। আম্বালা থেকে দিল্লী যেতে যেতে ইংরেজ সৈন্যরা পাশের গ্রাম থেকে নিরীহ পল্লীবাসীদের ধরে এনে হত্যা করতে লাগলো অতি নিষ্ঠুরভাবে।

মীরাট ও দিল্লীর খবর পৌঁছলো কাশীতে। এখানকার জনসাধারণের মধ্যেও সৃষ্টি হলো তুমুল চাঞ্চল্য। আঠারোশো সাতান্ন সালে খাবার জিনিসপত্রের খুব দাম বেড়ে যায়। লোকের ধারণা হলো যে কোম্পানীর শাসনদোষেই এইরকম হয়েছে। দিল্লীর বাদশাহ্‌দের বংশের যাঁরা কাশীতে ছিলেন, এই সময়ে তাঁরাও জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ প্রচার করতে

লাগলেন। এর ওপর নতুন বন্দুক ও টোটা তো ছিলোই—হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ভাবলো ইংরেজ তাদের ধর্মনাশ করতে উদ্যত। উত্তেজিত না হয়ে তারা পারে না। কাশীতে তখন ছিলো তিনদল সৈন্য। এই তিনদলের সংখ্যা প্রায় দু' হাজার আর কামান দাগতে পারে এমন ইংরেজ সৈন্য ছিলো ত্রিশজন।

কাশীর কাছেই আজমগড়। সেখানেও টোটার ব্যাপারে সিপাহীদের মধ্যে ঘোর উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। উত্তেজিত সিপাহীরা দু'জন ইংরেজ সৈনিক-কর্মচারীকে হত্যা করলো। ইংরেজদের থাকবার জায়গা পুড়িয়ে ছাই করে দিলো, জেলখানায় গিয়ে কয়েদীদের মুক্ত করে দিলো। শেষে সরকারের সাত লক্ষ টাকা লুঠ করলো। ইংরেজরা প্রথমে কাছারী-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলো আর নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলো চারদিকে কামান সাজিয়ে। কিন্তু আজমগড়ের অবস্থা ক্রমে এমন সংগিন হয়ে উঠলো যে তারা ভয়ে ছাউনি, কাছারীবাড়ি সব ফেলে গাজীপুরে পালিয়ে গেলো। 'ইংরেজ লোক ভাগ গিয়া',—এই বলে মনের আনন্দে সিপাহীরা চললো ফৈজাবাদের দিকে।

আজমগড়ের এই খবর কাশীতে পৌঁছতেই সেখানকার ইংরেজরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের সাহায্যের জন্যে সেনাপতি কর্ণেল নীল একদল

মাদ্রাজী সৈন্য নিয়ে কাশীতে উপস্থিত হলেন। দানাপুর থেকেও একদল সৈন্য তাঁদের সাহায্যের জন্যে এলো। এইভাবে আত্মরক্ষার সব ব্যবস্থা করে কাশীর সেনানিবাসের সেনাপতি ঠিক করলেন যে সিপাহীদের নিরস্ত্র করাই নিরাপদ।

কুচ্ কাওয়াজ করে সিপাহীরা ছাউনির মাঠে এসে সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। তাদের সামনে কামান, পেছনে একদল সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য। যদি সিপাহীরা বেঁকে বসে তাহ'লে কামানের তোপ দেগে তাদের উড়িয়ে দেওয়া হবে এই ঠিক ছিলো।

সামনে কামান, পেছনে সৈন্য দেখে সিপাহীদের সন্দেহ, আশংকা ও উত্তেজনা বেড়ে গেলো আরো। চোখের পলকে তারা বন্দুকে গুলি ভরে ইংরেজদের আক্রমণ করলো। সংগে সংগে সাত-আটজন ইংরেজ সৈনিক নিহত হলো।

বাকী ইংরেজ সৈনিকরা অমনি কামান দাগতে শুরু করলো। জনকুড়ি সিপাহী মরে গেলো, বাকী সিপাহীরা চকিতের মধ্যে ছাউনির এলাকা থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলো। তারা কাছাকাছি একটা লোকালয়ের মধ্যে আশ্রয় নিলো এবং এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থেকে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সিপাহীদের এই বিদ্রোহ, এই অভাবনীয় ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে পারলেন না সেনাপতি কর্ণেল নীল। তিনি তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে কৃতসংকল্প হলেন। সশস্ত্র ফৌজ নিয়ে তিনি তাড়া করলেন তাদের। যারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলো তাদের ধরিয়ে এনে গুলি করে মারলেন নির্মমভাবে; যাদের ধরা গেলো না, যারা নির্জন কুটীরে লুকিয়ে ছিলো, তাদের সেইসব কুটীরের সংগে পুড়িয়ে মারা হলো। সমস্ত কাশীতে সামরিক আইন জারি করা হলো। এই আইনের অপপ্রয়োগে কাশীর জনসাধারণের দুর্দশা উঠলো চরমে। অনেকের ফাঁসী হলো, অনেককে ধরে এনে প্রকাশ্যে চাবুক মারা হলো। কর্ণেল নীলের প্রতিশোধ এইখানেই ক্ষান্ত হলো না। কাশীর কাছাকাছি গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে সেখানকার অনেক লোককে রাস্তার দু'-ধারের গাছে গাছে ফাঁসী দিয়ে লোকের মনে গভীর আতংকের সৃষ্টি করলেন তিনি।

প্রতিশোধে অন্ধ ইংরেজদের নিষ্ঠুরতার একটি কাহিনী এখানে বলবো।

কাশীর রাস্তা দিয়ে কয়েকটি বালক চলেছে। সিপাহীদের পতাকা নিয়ে ও টম্‌টম্‌ বাজিয়ে তারা খেলা করতে করতে যাচ্ছিলো। তাদের ধরে আনা হলো। সামরিক বিচারালয়ের বিচারে এই কোমল-

মতি বালকদের ওপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো। একজন বিচারক কেঁদে ফেললেন। দয়া প্রদর্শন করবার জন্যে তিনি সেনাপতিকে অনেক করে অনুরোধ করলেন। কিন্তু বাকী দু'জন বিচারপতির প্রাণ গল্‌লো না, সেনাপতির ত নয়ই।

একজন ইংরেজ সৈনিক "সিপাহীযুদ্ধের স্মৃতিকথা" লিখতে গিয়ে কোম্পানীর ইংরেজ সৈনিকদের নিষ্ঠুরতার একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছে এইভাবে ঃ

"২৭শে জুন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের দলের ২৪০ জন সৈন্য (এদের মধ্যে আমিও একজন), ১১০ জন শিখ সৈন্য ও কুড়িজন ঘোড়সওয়ার কাণার ছাউনি থেকে যাত্রা করে। আমরা তিনদলে বিভক্ত হয়ে আশেপাশের গ্রামের মধ্যে অপরাধীদের খোঁজে ঢুকলাম। আমি যে-দলের সংগে ছিলাম, সেই দল একটা গ্রামের মধ্যে ঢুকলো। গ্রামটি জনশূন্য, আমরা সেই গ্রামের ঘরগুলোতে আগুন লাগালাম, আমাদের চোখের সামনেই গ্রামটি পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। দু'মাইল দূরে আর একটা গ্রামে এলাম। আমাদের আসতে দেখেই সেই গ্রামের লোকজন যে যেখানে পারলো ছুটে পালালো। আমরা তাদের ওপর গুলি ছুঁড়তে লাগলাম। আটজন লোক সংগে সংগে মারা গেলো। বিশজনকে আমরা বন্দী করলাম। একজন বুড়োলোক এগিয়ে

এলো। আমরা যে গ্রামটা জ্বালিয়ে দিচ্ছিলাম, তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে টাকা চাইলো। আমাদের সংগে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি এই বিষয়ের বিচার করে ফেললেন। ম্যাজিস্ট্রেট জানতে পেরেছিলেন যে ঐ বুড়ো লোকটি বিদ্রোহী সিপাহীদের আশ্রয় দিয়ে খাবার জিনিসপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিলো। তাকে ও একজন সিপাহীকে সেইখানকার একটা গাছের ডালে ফাঁসী দেওয়া হলো।... ...পরের দিন, সকালবেলা। আমরা আর একটা গ্রামে এলাম। তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আমাদের গন্তব্য পথে ফিরে এলাম। একদিকে আমরা এইভাবে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে, লোককে ফাঁসী দিয়ে চলেছি, অন্যদিকে অন্যান্য দলও নিষ্কর্মা ছিলো না, তারাও আমাদের মত এইসব নিষ্ঠুর কাজ করছিলো।... আমরা আশীজনকে বন্দী করেছিলাম, তাদের মধ্যে দু'জনকে ফাঁসী দিয়েছিলাম, আর বেতমারা হয়েছিলো ষাটজনকে।...পরের দিন আর একটা গ্রামে এসে আগুন দিলাম।... আমরা একটি বড় গ্রামে এলাম—অনেক লোকজনের বাস এখানে। গ্রামের দু'শো লোককে আমরা আটক করলাম, তারপর গ্রামটিতে আগুন লাগিয়ে দিলাম। গ্রামের মধ্যে ঢুকে দেখি চারদিকেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

দেখলাম একটি গৃহের মধ্যে একটি বৃদ্ধ বিছানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে আসবার চেষ্টা করছে, তার হাঁটবার ক্ষমতা ছিলো না। আমি খাটিয়াসমেত ঐ বৃদ্ধকে টেনে বের করলাম। চারদিকে আগুনের শিখা আর জমাট ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দেখি, আগুনের তেজে একটা ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়লো সশব্দে—সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি, একটা চার বছরের ছেলে সেই ঘরের দিকে আসছে। যে ঘরের মধ্যে ছেলেটি ছিলো আমি সেই দিকে ছুটে গেলাম—ভেতরে গিয়ে দেখি ঐ ছেলেটি ছাড়া আট থেকে দু'বছরের আরো দু'টি ছেলে সেখানে রয়েছে; দু'জন বুড়ো-বুড়িকেও দেখলাম, তাদের হাঁটবার ক্ষমতা নেই। একজন তরুণী স্ত্রীলোক তার শিশু-পুত্রটিকে বুকে জড়িয়ে রেখেছিলো—মনে হলো ছেলেটি পাঁচ-ছ' ঘণ্টা আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। চারদিক আগুনের শিখায় ছেয়ে গেছে। অনেক কষ্টেই সকলকে নিরাপদে বের করলাম ··· এই সময়ে বিউগল্ বেজে উঠ্লো, আমি ফিরে গেলাম। সেই গ্রামের বন্দীদের দশজনকে আমরা ফাঁসী দিয়েছিলাম, যাটজনকে চাবুক মারা হয়। সেই রাতে আমরা আর একটা গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে ফেললাম, সেখানকার আঠারজন লোককে আমরা গুলি করে মারলাম। চারদিকেই লেলিহান

অগ্নিশিখা, চারদিকেই হত্যার বীভৎস লীলা, চারদিকেই ভয়ার্তের রোদনধ্বনি। সেইসব নিষ্ঠুরতার দৃশ্য আমি জীবনে ভুলতে পারিনি।" ॥

কোম্পানীর এই অমানুষিক অত্যাচার, এই অকথ্য পীড়ন, এই নির্মম নিষ্করুণ প্রতিশোধ বিদ্রোহের আগুনকে কিন্তু নেবাতে পারলো না। আরম্ভে যা-ছিলো উত্তেজনা, যা-ছিলো বিক্ষোভ, এখন তা পরিপূর্ণ বিদ্রোহের রূপ নিয়ে সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। আম্বালা থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে কানপুর, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ থেকে কাশী, কাশী থেকে ঝাঁসী— সর্বত্র বিদ্রোহের জ্বালাময়ী শিখা লেলিহান হয়ে উঠলো। বিদ্রোহ এইবার তার উদ্যোগপর্ব অতিক্রম করে সংগ্রামের রূপ নিতে লাগলো। পরাধীন জাতির অন্তরে জেগে উঠলো স্বাধীনতার এক দুর্নিবার কামনা, এক দুর্দম সংকল্প। নগর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে পল্লীতে দেখতে দেখতে বন্যার স্রোতের মত উদ্বেল হয়ে উঠলো স্বাধীনতা-লাভের ইচ্ছা সর্বসাধারণের মনে। কি হিন্দু, কি মুসলমান— সবাই চাইলো কোম্পানীর রাজত্বের অবসান। পলাশি-যুদ্ধের একশো বছর পরে ভারতব্যাপী এই অভ্যুত্থানের পেছনে ছিলো ইতিহাসেরই নেপথ্য বিধান। এই অভ্যুত্থানের ফলেই সেদিন ভারতের

মাটিতে লোপ পেয়েছিলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব।

আজমগড় ও কাশীর সিপাহীদের বিদ্রোহের কথা জৌনপুরে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হলো না। প্রাণ-ভয়ে ভীত ইংরেজরা আশ্রয় নিলো কাছারীবাড়িতে। তাদের রক্ষা করবার জন্যে মোতায়েন থাকলো একদল শিখ সৈন্য। কিন্তু কাশীতে ইংরেজরা শিখদের ওপর কী অত্যাচার করেছে, তা জৌনপুরের শিখ সৈন্যদের অজানা রইলো না, টগ্‌বগ্‌ করে উঠ্‌লো শিখের রক্ত। কাছারীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন ইংরেজ সেনানায়ক। হঠাৎ তাঁর বুকে একটা গুলি এসে লাগলো। তিনি পড়ে গেলেন। ইংরেজদের মনে ভীষণ আতংকের সৃষ্টি হলো। তখুনি খবর এলো, জৌনপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট জেলখানার পথে বিদ্রোহীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। দেখতে দেখতে জৌনপুরের শিখ সৈন্যদল ক্ষেপে গেলো—তার তুলে ধরলো বিদ্রোহের পতাকা। কোম্পানীর ধনা-গার লুঠ করে তারা পেলো দু'লক্ষ ষাট হাজার টাকা জেলখানার কয়েদীদের তারা মুক্ত করে দিলো। জৌন-পুর সম্পূর্ণভাবে তাদের করতলগত হলো। নিরু-পায় ইংরেজরা তখন পালিয়ে প্রাণে বাঁচালো। শি সৈন্যদের সমবেত কণ্ঠের 'ওয়া গুরুকীফতে' ধ্বনি আ

মুহুর্মুহু বন্দুকের আওয়াজের ভেতর দিয়ে জৌনপুরে যেভাবে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়লো, তা দেখে ইংরেজ সেনাপতিরা বিস্মিত না হয়ে পারেন নি।





পাঁচ

বিপ্লবের করাল ছায়া ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সর্বত্র।

মীরাটের বিদ্রোহের খবর ১৪ই মে এলাহাবাদে এসে পৌঁছলো। নগরের সব জায়গায় এই নিয়ে চললো আলোচনা। ইংরেজদের মধ্যে দেখা দিলো আতংক। খাদ্যদ্রব্যের দাম ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ আগে থেকেই ধূমায়িত হয়েছিলো। এখন সেই অসন্তোষ যেন বিস্ফোরণের

রূপ নিতে চাইলো। চারদিকের আবহাওয়ার মধ্যে উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ্য ক'রে এলাহাবাদের ইংরেজরা আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হলো। ৫ই জুন তারা আশ্রয় নিলো দুর্গের মধ্যে।

কাশীর উত্তেজনা দেখ্‌তে দেখ্‌তে এলাহাবাদে এসে পৌঁছলো। কর্ণেল নীলের বীভৎস নিষ্ঠুরতার কাহিনীও এলাহাবাদের সিপাহীদের কানে এলো। তাদের মন স্বভাবতই বিচলিত হলো। তখন তারা উদ্যত হলো প্রতিশোধ নিতে। কাশী থেকে এলাহাবাদ আসবার পথে একটা সেতু আছে। কতকগুলো সিপাহীকে দু'টো কামান দিয়ে সেই সেতুটি রক্ষা করবার জন্যে পাঠানো হলো। কাশীর বিদ্রোহী সিপাহীদের সেই সেতু পার হয়ে এলাহাবাদে আসবার কথা।

৬ই জুন। রাত ৯টা।

হঠাৎ বেজে উঠ্‌লো ভেরী। সিপাহীরা ঘোষণা করেছে বিদ্রোহ।

যাদের পাঠানো হয়েছিলো সেতুরক্ষা করবার জন্যে, তারাই সূচনা করলো এই বিদ্রোহের।

সংগে সংগে একজন অধিনায়ককে পাঠানো হলো বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে। তিনি সিপাহীদের হাতে নিহত হলেন আর তাঁর সংগে যে সৈন্যদল গিয়েছিলো,

তারা যোগ দিলো বিদ্রোহীদের দলে। সেতুরক্ষার জন্যে যে কামান দু'টো দেওয়া হয়েছিলো, সেই কামান নিয়ে বিদ্রোহী সিপাহীরা ছাউনির মাঠে এলো। ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলেন কর্ণেল সিমসন। জিজ্ঞাসা করলেন তাদের, কেন তারা কামান সেখানে এনেছে।

গুড়ুম। গুড়ুম।

দু'জন সিপাহীর গুলি তার জবাব দিলো।

কর্ণেল সাহেব বেগতিক দেখে ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়া। ঘোড়া ছুটলো দুর্গের দিকে।

সিমসন পালালেন, কিন্তু সিপাহীরা যে ইংরেজকে সামনে দেখতে পেলো তাকেই মারবার চেষ্টা করতে লাগলো। জন আটেক তরুণ ইংরেজ সৈনিক নিহত হলো তখুনি। কর্ণেল সিমসন দুর্গে প্রবেশ করেই দুর্গের সিপাহীদের নিরস্ত্র করতে চাইলেন। হিন্দুস্থানী সিপাহীরা শান্তভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করলো বটে, কিন্তু তারা বাইরে এসে বিদ্রোহের শক্তি বাড়ালো।

তারপর সমস্ত রাত ধরে চললো লুঠপাট।

জেলখানার ফটক ভেঙে সিপাহীরা কয়েদীদের মুক্ত করে দিলো, তারা ছুটলো ইংরেজদের বাসস্থানের দিকে আর তাদের পেছনে উন্মত্ত জনসাধারণ। পথে তারা যে-সব ইংরেজকে দেখতে পেলো, নির্মমভাবে হত্যা

করলো তাদের, আগুন ধরিয়ে দিলো তাদের বাংলো-গুলোতে। আগুনের লেলিহান শিখায় সব ভস্মসাৎ হয়ে গেলো মুহূর্তমধ্যে। বিদ্রোহীরা রেলের কারখানা ধ্বংস করলো, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিলো। দুর্গের বাইরে যত ইংরেজ ছিলো তাদের প্রায় সকলেই নিহত হলো।

৭ই জুন। দুপুরবেলা।

এলাহাবাদের ধনাগার থেকে সিপাহীরা লুঠ করলো ত্রিশ লক্ষ টাকা।

তালুকদারেরা মনে করলো, কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয়েছে। জমিজমা কেড়ে নিয়েছিলো বলে কোম্পানীর বিরুদ্ধে তালুকদারদের ছিলো প্রচণ্ড বিক্ষোভ। তারা কৃষকদের উত্তেজিত করলো। কৃষকরা এগিয়ে এসে হাত মেলালো বিদ্রোহীদের সংগে। মৌলভীরাও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কোম্পানী-বিদ্বেষ প্রচার করতে লাগলো। এমনি করে নগরের বাইরে সুদূর পল্লীগ্রামেও জনসাধারণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হলো।

১১ই জুন। কর্ণেল নীল কাশী থেকে প্রবেশ করলেন এলাহাবাদ দুর্গে। এলাহাবাদের উত্তপ্ত পরিবেশ বিচলিত করলো তাঁকেও। প্রথমেই দু'খানা জাহাজে

করে ইংরেজ-শিশু ও নারীদের ক'লকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। তারপর একটা জাহাজে কামান সাজিয়ে তিনি গংগার দুই তীরের গ্রামগুলোর দিকে গোলা বর্ষণ করে জনসাধারণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে লাগলেন আর একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন পল্লীগ্রাম আক্রমণের জন্যে। সাময়িকভাবে এলাহাবাদে শান্তি-শৃংখলা ও কোম্পানীর প্রাধান্য আবার প্রতিষ্ঠিত হলো, কিন্তু রাজপুরুষরা একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তার কারণ বড়লাটের ঐ নতুন আইন, যার বলে বিচারপতিদের হাতে ভারতবাসীর জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো খেলার সামগ্রী; শুধু সন্দেহে, বিনা প্রমাণে সরাসরি বিচার চলতে লাগলো। একমাত্র দণ্ড ফাঁসী। যার যে অপরাধই হোক না কেন, তারই হ'লো ফাঁসী। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক মেলিসন পর্যন্ত এলাহাবাদে ফাঁসীর ব্যাপার সম্পর্কে লিখেছেন, "একজন লোকের কাছে এক থলে পয়সা পাওয়া যায় বলে তার ফাঁসী হয়। পথের ধারে ও বাজারে যে সব লোককে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিলো, তাদের মৃতদেহ গংগায় ফেলে দেবার জন্যে দরকার হয়েছিলো আটখানা গাড়ি। তিন মাস এই গাড়িতে প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সরাসরি বিচারে এইভাবে ন'হাজার

লোকের জীবন কষ্ট হয়েছিলো।' কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়—সবাই প্রাণ দিয়েছিলো নির্ভীকভাবে, একটি লোকও জীবন-ভিক্ষা করেনি।"

সেদিন ভারতবাসী এমনি করে প্রাণ দিয়েছিলো বলেই না প্রাণ জেগেছিলো দুর্বার তেজে।

সেই প্রাণের বহ্নি ছড়িয়ে পড়েছিলো সমস্ত দেশে।

সেই আগুনেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাঙা হয়ে আছে আঠারশো সাতান্ন-র সেই বিদ্রোহের কাহিনী।

ইতিমধ্যে কানপুরও অবরুদ্ধ হয়েছে। সেখানেও উড়েছে বিদ্রোহের জয়-পতাকা।

৩০শে জুন। চারশো ইংরেজ সৈন্য, তিনশো শিখ, একশো ঘোড়সওয়ার ও দু'টো কামান নিয়ে কাপ্তেন রেণ্ড চল্লেন কানপুর উদ্ধার ক'রতে। কর্ণেল নীল কাপ্তেন রেণ্ডকে একখানি চিঠিতে লিখলেন যে, বিদ্রোহ দমনের জন্যে যতদূর সম্ভব নিষ্ঠুরতার অভিযান চালাতে হবে। নির্বিচারে ফাঁসী দিয়ে, ঘরে আগুন লাগিয়ে, লুঠ করে, ধ্বংস করে—এমন বিভীষিকা সৃষ্টি করতে হবে যাতে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ বিদ্রোহীদের সংগে যোগ দিতে সাহস না পায়।

কাপ্তেন রেণ্ড সসৈন্যে কানপুর যাত্রা করলেন এই আদেশ প্রতিপালন করবার জন্যে।

নিরীহ পল্লীবাসীদের ধরে ধরে গাছের ডালে ফাঁসী দেওয়া হলো। পথের দু'ধারে ঝুলতে লাগলো অসংখ্য মৃতদেহ। অবাধে চললো গৃহদাহ আর নরহত্যা।

কোম্পানীর প্রধান সেনাপতি তখন স্যর প্যাট্রিক গ্রাণ্ট।

তিনি কর্ণেল হ্যাভলককে আদেশ দিলেন এলাহাবাদ হয়ে কানপুর ও লক্ষ্মৌ যাবার জন্যে। এই সময়ে কানপুরে দেশীয় সৈন্য ছিলো দু'হাজার, আর ইংরেজ সৈন্য মাত্র তিনশো। কানপুর সেনানিবাসের সেনাপতি তখন স্যর হিউ হুইলার। কানপুরের সিপাহীদের মধ্যে যখন চাঞ্চল্য দেখা গেলো, ইংরেজরা তখন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। মীরাট ও দিল্লীর খবরেই তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিলো, এখন তাদের দৃষ্টিতে কেবল বিভীষিকাই ফুটে উঠতে লাগলো। কানপুরের ইংরেজরা তৈরি হলো আত্মরক্ষার জন্যে।

সেনানিবাসের কাছাকাছি ছিলো ইংরেজ সৈন্যদের একটা হাসপাতাল। আত্মরক্ষার স্থান হিসেবে তারা এই হাসপাতালকেই বেছে নিলো। হাসপাতালটির চারদিকে আট হাত উঁচু বিরাট মাটির প্রাচীর তোলা হলো অল্পসময়ের মধ্যেই। তারপর সেনাপতি স্যর হিউ হুইলার লক্ষ্মৌ রেসিডেন্সীর স্যর হেনরী লারেন্সকে অনুরোধ করলেন কানপুরে সৈন্য পাঠাবার জন্যে।

দু'টি বড় কামান ও প্রায় একশো জন পদাতিক সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো কানপুরে। এত করেও হুইলার কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি নানাসাহেবের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। বিঠুরে লোক গেলো তাঁর এই অনুরোধ নিয়ে। সেখানে তখন নানাসাহেবের ছেলেবেলার বন্ধু ও বিখ্যাত যোদ্ধা তাঁতিয়া তোপিও ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপির নাম অক্ষয় হয়ে আছে। কানপুরের বিদ্রোহের তাঁরাই ছিলেন নায়ক। বিঠুরের রাজপ্রাসাদেই চলতো বিদ্রোহের গোপন ষড়যন্ত্র। পরামর্শ দিতেন তাঁতিয়া তোপি আর আজিমউল্লা। হুইলারের অনুরোধ যখন নানাসাহেবের কাছে পৌঁছলো, তখনই তিনি আজিম উল্লা ও তাঁতিয়া তোপির সংগে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। নানাসাহেব ইংরেজদের সাহায্য করতে রাজী হলেন। তাঁর ওপর ধনাগার রক্ষার ভার দেওয়া হলো। কানপুরের ধনাগারটি ছিলো নবাবগঞ্জে নানাসাহেব তাঁর দু'শো অনুচরকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

শহরে প্রবল জনরব। সর্বত্র আতংকের ভাব! সমস্ত ইংরেজ নরনারী এসে আশ্রয় নিলো সেই হাসপাতালে। মাটির প্রাচীরে রাখা হলো কয়েকটি কামান।

প্রাচীরের ওপর ইংরেজের কামান দেখে সিপাহীদের সন্দেহ গেলো বেড়ে। তারা অশান্ত হয়ে উঠলো। প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলো দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলের সৈন্যরা। এরা বেশীরভাগই ছিলো মুসলমান। সুবাদার তাদের শান্ত রাখবার চেষ্টা করলেন। বিদ্রোহীরা তাঁকে তলোয়ার দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কোট ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের অনুসরণ করলো পদাতিক সৈন্য। সকলেই ছুটলো নবাবগঞ্জের দিকে। এইখানেই ছিলো কোম্পানীর ধনাগার, অস্ত্রাগার আর কারাগার। যে-সব বিশ্বস্ত সিপাহী ধনাগার-রক্ষায় নিযুক্ত ছিলো, তারা বিদ্রোহীদের আক্রমণ ঠেকাতে পারলো না। কাজেই উন্মত্ত সিপাহীরা ধনাগার লুঠ করলো, জেলখানার লোহার ফটক ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করলো এবং অস্ত্রাগারে ঢুকে দখল করলো কামান, বন্দুক ও বারুদ। কোম্পানীর কাগজ-পত্রও সব পুড়িয়ে দিলো তারা।

এদিকে সেনানিবাসে দু'দল অনুরক্ত সিপাহী যখন নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছিলো, তখন সেনাপতি হুইলার হুকুম দিলেন তাদের ওপর কামানের গোলা ছুঁড়তে। গোলাবৃষ্টি হতে লাগলো। অনুরক্ত সিপাহীদের ভুল ভাঙলো। তারা বাধ্য হয়ে নবাবগঞ্জে গিয়ে যোগ দিলো বিদ্রোহীদের সংগে। তখন

সেই বিদ্রোহীরা নানাসাহেবকে অনুরোধ করলো: "আপনি আমাদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব করুন, আমরা আপনার হুকুম মেনে চ'লবো।" নানাসাহেবের মনে পড়লো ডালহৌসির সেই অবিচারের কথা--কিভাবে তিনি তাঁর পৈতৃক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তার কথা। তিনি বিদ্রোহীদের পক্ষে দাঁড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

৬ই জুন। শনিবার।

সেনাপতি হুইলার নানাসাহেবের কাছ থেকে চিঠি পেলেন। চিঠি নয়--যেন মৃত্যুর পরওয়ানা। সেই চিঠিতে নানাসাহেব লিখেছিলেন যে তিনি ইংরেজদের আত্মরক্ষার জায়গা আক্রমণ করবেন। আতংকে বিহ্বল হয়ে সেই প্রাচীর-ঘেরা জায়গাটি রক্ষা করবার জন্যে কামানে গোলা ভরা হলো, পদাতিক সৈন্যরা সঙীন-সমেত গুলিভরা বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালো, গোলন্দাজরা প্রাচীরের বাইরে কামানে আগুন লাগাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। প্রত্যেক সমর্থ ইংরেজকেই অস্ত্রধারণ করতে হলো। প্রায় হাজার ইংরেজ নর-নারী আর শিশু ছিলো সেইখানে। দিনরাত সবসময়ই সৈন্যরা সতর্ক। বিদ্রোহীদের গোলাবর্ষণে নিহত হলো অনেকে।



নানাসাহেব

সিপাহীদেরও অনেকে হতাহত হলো। এমনি করে কেটে গেলো সাত দিন।

হাসপাতালের দু'টো বড় বড় বাড়ির একটাতে ছিলো খড়ের চালা। একদিন বিকেলে হঠাৎ এই চালা জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। রাত্রিতে আগুনের শিখা ছুঁয়ে ফেললো আকাশ। এর ফলে স্ত্রীলোক ও শিশুদের আর আশ্রয়স্থান থাকলো না। পাশেই 'সবেদা কুঠি'। নানাসাহেব থাকেন সেই কুঠিতে। এই কুঠিতে বসেই তাঁতিয়া তোপি ও আজিমউল্লা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কূট-মন্ত্রণায় নিযুক্ত ছিলেন। এখান থেকেই হিন্দু ও মুসলমান একযোগে ইংরেজদের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হয়েছিলো।

ক্রমে অবরোধ অসহ্য হয়ে উঠলো। অবরুদ্ধ ইংরেজরা এলাহাবাদের পথের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো সাহায্যকারী সৈনিকদলের। কিন্তু সাহায্য আর আসে না। খাবার জিনিসপত্রও ফুরিয়ে এলো; দেখা দিলো ভীষণ জলকষ্ট। এইভাবে অবরুদ্ধ ইংরেজদের সকল রকমেই দুর্দশার একশেষ হতে লাগলো। এই অবস্থাতেই নিহত হলো আড়াইশো ইংরেজ। কাছেই একটা প্রকাণ্ড পুরোনো কূপ ছিলো। তারই মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো ঐসব মৃতদেহ।

আরো দু'সপ্তাহ কেটে গেলো। তখন একদিন নানাসাহেবের শিবির থেকে একখানা চিঠি নিয়ে পাল্কীতে চড়ে এলো এক ইংরেজ মহিলা সেনাপতি হুইলারের কাছে। নানাসাহেবের নামে আজিমউল্লার লেখা সেই চিঠিতে ছিলো ঃ "লর্ড ডালহৌসির কাজের সংগে যাদের কোনরকম সম্বন্ধ নেই এবং যারা অস্ত্র পরিত্যাগ করতে রাজী, তারা নিরাপদে এলাহাবাদে যেতে পারবে। তাদের জন্যে নৌকো প্রস্তুত থাকবে। এবং সেইসব নৌকোয় থাকবে খাবার জিনিসপত্র"।

পরের দিনই ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করলো। বিদ্রোহীদের হাতে সমর্পণ করলে গোলা, বারুদ আর কামান।

২৭শে জুন। সকালবেলা।

কানপুরের সতীচৌরা ঘাট। ঘাটের ধারে অনেকগুলো নৌকো। গ্রীষ্মকালের গংগা। গংগায় তখন জল কম। কাজেই নৌকো একেবারে ঘাটের ধারে আসতে পারলো না। প্রায় পাঁচশো ইংরেজ নর-নারী গংগার ঘাটে এসে উপস্থিত হলো। তাদের সংগে ছিলেন বৃদ্ধ সেনাপতি হুইলার এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ে। হাঁটুজল ভেঙে তাদের সবাইকে নৌকোয় উঠতে হলো। সকাল ন'টার মধ্যেই নৌকোয় ওঠা শেষ হলো। তাঁতিয়া

তোপি আর আজিমউল্লা কয়েকজন অশ্বারোহী সৈনিক ও গোলন্দাজদের নিয়ে গংগার তীরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

নৌকো ছেড়ে দেবার পরমুহূর্তেই বেজে উঠ্‌লো ভেরী।

সংগে সংগে মাঝিরা নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়লো

দুই তীর থেকে নৌকোর ওপর হ'তে লাগলো অজস্র গোলাবর্ষণ।

জ্বলে উঠ্‌লো নৌকোর ছইগুলো।

গংগার জল লালে লাল হয়ে গেলো।

গোলার শব্দ আর আর্তনাদ মিলে একটা ভীষণ কোলাহল সৃষ্টি করলো।

বাকী ইংরেজদের আটক করে রাখা হলো 'সবেদা কুঠি'তে।

১লা জুলাই। বিদ্রোহীরা নানাসাহেবকে 'পেশোয়া' বলে ঘোষণা করলো। সন্ধ্যার পর থেকে সমস্ত কানপুর ঝলমল করতে লাগলো আলোকমালায়। উৎসবের মধ্যেই নানাসাহেব খবর পেলেন সেনাপতি হ্যাভলক আসছেন সসৈন্যে। তিনি প্রস্তুত হলেন। সাতদিনের মধ্যেই দেড়হাজার সৈন্য, ছ'শো দেশীয় সৈন্য আর আটটি কামান নিয়ে হ্যাভলক ও রেণ্ড কানপুরের কাছাকাছি ফতেপুরে এসে উপস্থিত

হলেন। তাঁদের বাধা দেবার জন্যে বিদ্রোহীদের পক্ষে সেনাপতি জওয়ালাপ্রসাদ ও টিকাসিংহ দেড়হাজার পদাতিক ও গোলন্দাজ, পাঁচশো অশ্বারোহী ও দেড় হাজার সাধারণ লোক নিয়ে যাত্রা করলেন ফতেপুর। তাঁদের সংগে কামানও ছিলো বারটি।

১২ই জুলাই। স্থান—ফতেপুর।

একদিকে সসৈন্য হ্যাভলক, অন্য দিকে সবাহিনী জওয়ালাপ্রসাদ। দু'জনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। এই বিখ্যাত যুদ্ধে জওয়ালাপ্রসাদের অশ্বারোহী সৈন্যরা অসাধারণ বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য দেখালো। ইংরেজের অশ্বারোহীদল হটে গেলো এদের প্রচণ্ড আক্রমণে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজরা পেয়ে গিছ্‌লো আরও কামান ও বন্দুক। তাই সেনাপতি হ্যাভলকই শেষে জয়লাভ করলেন ফতেপুরের যুদ্ধে। কিন্তু যে পাঁচ দিন ফতেপুর বিদ্রোহীদের অধীনে ছিলো সেই পাঁচ দিনে উত্তেজিত সিপাহীরা মুক্ত করলো কয়েদীদের, লুঠ করলো ধনাগার আর আগুন লাগিয়ে দিলো কাছারীবাড়িতে। ফতেপুর-যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজয়ী হ্যাভলক চললেন কানপুরের দিকে।

ফতেপুরের খবর যখন কানপুরে নানাসাহেবের কাছে এসে পৌঁছলো, তিনি ঠিক করলেন হ্যাভলকের

সংগে কানপুরেই শক্তির পরীক্ষা করবেন। সেইভাবে প্রস্তুত হলেন নানাসাহেব। কিন্তু তার আগে তিনি আর একটা লোমহর্ষণ কাণ্ড করলেন। যে-সব ইংরেজ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের বন্দী করে 'সবেদা কুঠি'তে রাখা হয়েছিলো, তাদের তিনি ইতিমধ্যে বিবিঘর নামে একটা বাড়িতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। আজিমউল্লার কুমন্ত্রণায় প্রায় দু'শো অবরুদ্ধ ইংরেজ মহিলা ও বালক-বালিকাকে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো এই বিবিঘরে।

পাঁচশো সৈন্য নিয়ে নানাসাহেব প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্যে।

সৈন্য-সমাবেশ করা হলো কানপুর থেকে চার-মাইল দূরে। যেখানে তিনি ব্যূহ রচনা করলেন, সেখান দিয়েই ইংরেজ সৈন্যের কানপুরে আসবার পথ। বহুদর্শী, রণ-নিপুণ হ্যাভলক সৈন্য-সমাবেশে নানা-সাহেবের নিপুণতা দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলেন। ব্যূহ একরকম দুর্ভেদ্য বললেই হয়। তাঁর ছিলো এক হাজার ইংরেজ সৈন্য আর তিনশো শিখ।

১৬ই জুলাই।

হিসাবী হ্যাভলক বিপক্ষকে আক্রমণ করতে সাহস পেলেন না। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সংগে সৈন্য সন্নিবেশ করলেন। নানাসাহেবের সৈন্যরা

তোপ দাগলো, ইংরেজ সৈন্য কোনমতেই তা প্রতিরোধ করতে পারলো না। এ পক্ষে চললো পদাতিকের গুলিবৃষ্টি, ও-পক্ষে তোপ –অবিরাম তোপ। ক্রমে ইংরেজ সৈন্য এগিয়ে এলো বন্দুকের সঙীন উঁচিয়ে, দখল করলো সিপাহীদের কামান। নানাসাহেবের অশ্বারোহীদল তাদের ঘিরে ফেললো অর্ধচন্দ্রাকারে, কিন্তু চালকের অভাবে তারা হয়ে পড়লো বিচ্ছিন্ন। আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধের পরাজয়ের আশা ত্যাগ করে নানাসাহেব যুদ্ধস্থান ত্যাগ করলেন। তারপর তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে গংগা পার হয়ে পালিয়ে গেলেন সকলের অলক্ষিতে।

১৭ই জুলাই।

হ্যাভলক অধিকার করলেন কানপুর। কানপুরে আবার কোম্পানীর প্রাধান্য স্থাপিত হলো।

উড়লো ইংরেজের বিজয়-পতাকা।

বিদ্রোহী সিপাহীরা যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেলো ছত্রভংগ হয়ে।





ছয়

দিল্লী ও মীরাটের সংবাদ পৌঁছলো লাহোরে। চাঞ্চল্য জাগলো এখানকার সিপাহীদের মধ্যে। লাহোর থেকে ছ'মাইল দূরে মিয়াঁ মিরেব সেনানিবাস। এই সেনানিবাসে ছিলো তিনদল দেশীয় পদাতিক, একদল অশ্বারোহী, কয়েকজন কামানরক্ষক আর একদল ইংরেজ পদাতিক সৈন্য। পাঞ্জাবের প্রধান কমিশনার তখন স্যর জন লরেন্স।

১৩ই মে।

সকালবেলায় সমস্ত সিপাহীদলকে কুচকাওয়াজ করে সমবেত হবার আদেশ দেওয়া হলো। কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিলো তাদের নিরস্ত্র করা। কেননা তাঁদের ভয় ছিলো, পাছে লাহোরেও মীরাট ও দিল্লীর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সিপাহীরা এলো শান্তভাবে মার্চ করে। দেখলো, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সৈন্য আর পেছনে বারুদভরা কামান। কর্তৃপক্ষের মতলব তারা কিছুই জানতে পারেনি। কাওয়াজের মাঠে তাদের আদেশ দেওয়া হলো অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে এক জায়গায় রেখে দেবার জন্যে।

সামনে ইংরেজ সৈন্য, পেছনে কামান, তার ওপর এই রকম আদেশ—সিপাহীরা এবার সবই বুঝতে পারলো। বিনা আপত্তিতে তারা পরিত্যাগ করলো অস্ত্রশস্ত্র। এইভাবে আড়াই হাজার সিপাহীকে নিরস্ত্র করা হলো ছ'শো ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে।

অমৃতসারের গোবিন্দগড় দুর্গ।

সেখানেও একদল সিপাহী ছিলো আর তাদেরও নিরস্ত্র করা হলো।

কিন্তু কোম্পানীর দুশ্চিন্তা হলো ফিরোজপুরকে নিয়ে।

ফিরোজপুরের ছাউনিতে প্রচুর পরিমাণে ছিলো গোলা, গুলি আর বারুদ। মীরাট ও দিল্লীর সংবাদে এখানকার সিপাহীরাও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে জনসাধারণের মধ্যেও। সিপাহীদের ভাবগতিক লক্ষ্য করে ইংরেজরা আতংকে শিউরে ওঠে। তাদের চোখের সামনে কেবলি ভেসে ওঠে মীরাট ও দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের ছবি। ফিরোজপুরের ইংরেজ সৈন্যরা অস্ত্রাগার রক্ষার ব্যবস্থা করলো বটে, কিন্তু সেনানিবাসের বিশৃংখলা ও জনসাধারণের উত্তেজনা কমাতে পারলো না। একদিন জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে ইংরেজ অফিসারদের খাবার ঘর, গীর্জা, বাংলো ইত্যাদি লুঠ করলো আর আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিলো অনেক ঘর-বাড়ি। একদল সিপাহীকে নিরস্ত্র করা হলো, কিন্তু আরেকদল অমান্য করলো কর্তৃপক্ষের আদেশ। তখন বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে গোলা-গুলি সব ধ্বংস করে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হলেন।

উত্তেজিত সিপাহীর দল ছুটলো দিল্লীর দিকে।

তাদের পেছনে তাড়া করলো একদল ইংরেজ সৈন্য।

পথে তাদের অনেকেই প্রাণ দিলো সিপাহীদের গুলির মুখে।

জলন্ধর পাঞ্জাবের আর একটা বড় সেনানিবাস। এখানেও ইংরেজরা প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহের বিভীষিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লো। যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে এই আশংকা করে ইংরেজরা কপূরতলার মহারাজ রণবীর সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করলো। যদিও কোম্পানী কপূরতলার কিছুটা গ্রাস করেছিলো তবু রণবীর সিংহ পাঁচশো সৈন্য আর দুটো কামান দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করলেন। কপূরতলার মত ভারতের ছোট-বড় অনেক দেশী রাজাই সেই সময়ে তাঁদের সর্বস্ব দিয়ে কোম্পানীকে যদি সাহায্য না করতেন, তাহলে ভারতবর্ষ হয়তো সেই সময়েই স্বাধীন হয়ে যেতো। কিন্তু মির্জাফরের দল যুগে যুগে সব দেশেই ইতিহাসে অঘটন ঘটিয়ে থাকে। পলাশী-যুদ্ধের সময়ে ক্লাইভকে সাহায্য করবার জন্যে একজন মির্জাফর ছিলো, সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে দেখা গেলো মির্জাফরের আর শেষ নেই।

মীরাট ও দিল্লীর খবর পৌঁছে গেলো পেশোয়ার পর্যন্ত।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজধানী পেশোয়ার। এখানে তখন ছিলো একটা বড় সেনানিবাস। পেশোয়ার ডিভিসনে ছিলো আড়াই হাজার ইংরেজ সৈন্য আর দশ হাজার ভারতীয় সিপাহী। এখানকার সেনানিবাসের

ভার ছিলো কর্ণেল নিকল্সনের ওপর, জেনারেল রিড্ ছিলেন এই বিভাগের প্রধান সেনাপতি আর সমগ্র প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন স্যর জন লরেন্স। লরেন্স আর রিড্ দু'জনে মিলে পরামর্শ করে ইংরেজদের রক্ষা করবার জন্যে আফগান আর শিখদের নিয়ে একটা নতুন সৈন্যদল গঠন করলেন। পুলিশের শক্তিও বৃদ্ধি করা হলো মাত্রা ছাড়িয়ে। সেই সংগে নতুন আইনের বলে দেওয়ানী বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারী, কোম্পানীর বিপক্ষ—এই সন্দেহমাত্রে যাকে-তাকে ফাঁসীকাঠে ঝোলাবার ক্ষমতা পেলেন। এইভাবে এলাহাবাদের মত পাঞ্জাবেও ভীষণ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলো।

সীমান্তের সিপাহীরা তখনো শান্ত ছিলো, তখনো তাদের মধ্যে বিদ্রোহের কোন লক্ষণই দেখা দেয়নি। তবু প্রাণের ভয়ে কোম্পানীর সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদেরও নিরস্ত্র করতে উদ্যত হলেন। কর্ণেল নিকল্সন পাঁচদল সিপাহীর মধ্যে চারদলকেই নিরস্ত্র করার সংকল্প করলেন। কাওয়াজের মাঠে সিপাহীরা এসে দাঁড়ালো হুকুমমত। তাদের সামনে ইংরেজ সৈন্যদের উদ্যত সঙীন, বন্দুক, পেছনে গোলা-ভরা কামান। সিপাহীরা অস্ত্র ত্যাগ করলো। কিন্তু তাদের মনে জন্মালো সন্দেহ আর আতংক। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তারা পেশোয়ার থেকে পালিয়ে গেলো।

কর্তৃপক্ষের হুকুম ছাড়া ব্যারাক, ত্যাগ করা নিষিদ্ধ আর তা অপরাধ বলে গণ্য হয়। তাই যে-সব নিরস্ত্র সিপাহী সেনানিবাস ত্যাগ করে চলে গেলো, ইংরেজ সৈন্য ধাওয়া করলো তাদের পিছু পিছু। ধরা পড়লো যারা তাদের মধ্যে অনেকেরই ফাঁসী হলো।

পেশোয়ারের কাছেই নওশেরা।

এখানেও একটি সেনানিবাস ছিলো। এখানকার সিপাহীরা ছিলো শান্ত ও বিশ্বস্ত। কিন্তু কর্ণেল নিকলসন এদেরও নিরস্ত্র করবার হুকুম দিলেন আর সংগে সংগে পেশোয়ার থেকে অনেক ইংরেজ সৈন্য সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। হঠাৎ এত ইংরেজ সৈন্যের আমদানী দেখে ক্ষেপে উঠলো নওশেরার সিপাহীরা। একশো কুড়িজন ছাড়া বাকী সব সিপাহী গোলা-গুলি নিয়ে নানা জায়গায় পালিয়ে গেলো। তাদের পেছনে ধাওয়া করলো একদল সৈন্য। দুর্গম পার্বত্য পথ। সেই পথ দিয়ে চলেছে পলাতক সিপাহীরা। একশো কুড়িজন মারা গেলো। বন্দী হলো দেড়শো, আর আহত হলো প্রায় তিন-চারশো। তবু তারা খুব বীরত্বের সংগেই যুদ্ধ করলো। অবশেষে পলাতক সিপাহীরা খাবার জিনিসের অভাবে, বৃষ্টিতে, হিমে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। কোথাও তারা একটু আশ্রয় পেলো না।

তাদের মধ্যে কারো ফাঁসী হলো, কারো প্রাণ গেলো কামানের মুখে। আগে যারা ধরা পড়েছিলো তাদের অনেককেই কামানের গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হলো, বাকী সকলের প্রতি হলো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা।

৭ই জুন।

জলন্ধরের ইংরেজ সেনাপতির বাংলোয় হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠ্‌লো।

তখন গভীর রাত্রি। রাত্রির অন্ধকারে আগুনের লেলিহান শিখা আকাশের পটে পরিব্যাপ্ত হলো। চারদিক মুখরিত হ'লো বিদ্রোহীদের ভীষণ কোলাহলে। ভয় পেলো ইংরেজরা। ইংরেজ মহিলারা তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে চেষ্টা করলো পালাবার। কিন্তু সিপাহীরা আর বেশী কিছু করলো না। সেনানিবাস ছেড়ে চলে গেলো তারা। লেফ্‌টেন্যাণ্ট উইলিয়াম্‌স্‌ একদল শিখ সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু ছুটলেন। অনেক দূর গিয়ে শতদ্রু নদীর তীরে বিদ্রোহী সিপাহীদের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। আরম্ভ হলো সামনা-সামনি যুদ্ধ। যুদ্ধে জয়লাভ করলো সিপাহীরা। বিজয়ী বিদ্রোহীর দল এগিয়ে চললো লুধিয়ানায়। লুধিয়ানা-দুর্গের সিপাহীরা যোগ দিলো তাদের সংগে আর সেখানকার জনসাধারণ তাদের দিলো উৎসাহ।

জেলখানার বন্দীরা মুক্তিলাভ করলো, ইংরেজদের ঘরে ঘরে লুঠপাট আরম্ভ হলো। তারপর সিপাহীরা আর কিছু না করে রাতের বেলাতেই চললো দিল্লীর দিকে।

সিপাহীরা তো চলে গেলো।

একদল ইংরেজ সৈন্য এলো লুধিয়ানায়।

সেখানকার অধিবাসীদের ওপর তারা শুরু করলো অকথ্য অত্যাচার। দলে দলে লোক ধরে আনা হ'লো, তাদের বিচার হ'লো আর কথায় কথায় আরম্ভ হলো ফাঁসী। যার কাছেই যুদ্ধের কোন অস্ত্র পাওয়া গেলো তাকেই দেওয়া হলো কঠোর দণ্ড।

সারা পাঞ্জাবে এসেছে বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্ত।

বিপন্ন ইংরেজ।

সেই ইংরেজদের নানাভাবে সাহায্য ক'রে নাভা, পাতিয়ালার রাজারা তাঁদের রাজভক্তির পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করলেন না এতটুকু।

পেশোয়ার থেকে পাঠানো হলো কাপ্তেন ডেলিকে দিল্লী উদ্ধারের জন্যে। তাঁর সংগে একদল সৈন্য। লুধিয়ানা আর আম্বালার পথে ইংরেজ সৈন্যরা অনেক অত্যাচার করলো। অনেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলো, বহুলোক আহত ও বন্দী হলো, তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হলো আর অনেককে ঝুলিয়ে দেওয়া

হলো ফাঁসীকাঠে। বন্দুকের গুলিতেও প্রাণ গেলো অনেকের। এইভাবে বীরত্ব প্রকাশ করতে করতে ডেলি সসৈন্যে দিল্লী গিয়ে পৌঁছলেন।

১৯শে জুন। দিল্লী।

সবেমাত্র সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে।

একদল সিপাহী ইংরেজদের আক্রমণ করলো। ইংরেজ-পক্ষে মারা গেলো কুড়িজন, আহত হলো সাতাত্তর জন। কাশ্মীর-ফটকের কাছে কাপ্তেন ডেলি বিদ্রোহীদের গুলিতে আহত হলেন। অন্ধকার যখন গাঢ় হয়ে দিল্লীর পথঘাট ঢেকে ফেললো, তখন ফিরে গেলো সিপাহীরা।

দিল্লীর মানমন্দিরে ইংরেজরা সৈন্য সমাবেশ করেছে। কামানও বসিয়েছে অনেকগুলো।

২২শে জুন।

পাঞ্জাব থেকে সাড়ে আটশো সৈন্য আর পাঁচটি কামান এলো।

ইংরেজের হতাশ প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হলো।

এদিকে পাঞ্জাবের নানা জায়গা থেকে দলে দলে বিদ্রোহী সিপাহীরাও এসে জড়ো হলো দিল্লীতে।

উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যে আবার টলমল করে উঠ্‌লো দিল্লী।

পরের দিন। সকালবেলা। লাহোর-তোরণ দিয়ে বের হলো একদল সিপাহী। ইংরেজরা আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলো। তাদের প্রতিরোধের ভিতর দিয়ে বিদ্রোহীরা সহজে পথ করে নিতে পারলো না; ইংরেজ-শিবিরের শুধু দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করতে পারলো তারা। সারা দিন তুমুল যুদ্ধ চললো। পাঞ্জাব থেকে নতুন সৈন্যদল আসায় বেড়ে গেলো ইংরেজপক্ষের শক্তি। সন্ধ্যার পর সিপাহীরা ফিরে গেলো শহরে। ইংরেজরা অধিকার করলো সব্‌জীমণ্ডি।

৫ই জুলাই।

সেনাপতি বার্ণার্ড নিহত হলেন। তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন সেনাপতি রিড্‌।

একমাস কেটে গেলো। দিল্লী তেমনি অবরুদ্ধ।

সসৈন্যে সেনাপতি রিড্‌ দিল্লীর কাছে রইলেন বটে, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না তিনি।

দিন দিন ইংরেজপক্ষের হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চললো। বিপদের ওপর নতুন বিপদ—সৈন্যদের নানা-রকমের অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে লাগলো।

অবস্থা বেগতিক দেখে পদত্যাগ করলেন রিড্।

রিডের জায়গায় এলেন উইলসন্। নতুন সেনাপতি।

বিদ্রোহী সিপাহীদের বারবার আক্রমণে উইলসন্ও বিপর্যস্ত হতে লাগলেন।

দেড় মাসের মধ্যে যুদ্ধ হলো বিশ বার।

ইংরেজ সৈন্যদের ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, স্বস্তি নেই। উৎকণ্ঠায় দিন কাটে, রাত কাটে দুশ্চিন্তায়। সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়—ঐ বুঝি বিদ্রোহীরা আক্রমণ করলো।

সব সময় বন্দুকের সঙীন উঁচিয়ে ইংরেজ-শিবিরে সৈনিকদের থাকতে হয় সতর্ক।

সেনাপতিদের থাকতে হয় সজাগ, আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উদ্বিগ্ন।

দেখতে দেখতে চার মাস কেটে গেলো।

দিল্লী তেমনি অবরুদ্ধ।

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সামরিক বিভাগের ওপর কেবলই চাপ দিতে লাগলেন—যেমন করে পার বিদ্রোহ দমন করা চাই আর উদ্ধার করা চাই দিল্লী।

ভারতের নানা জায়গা থেকে, বিশেষ করে পাঞ্জাব থেকে, আরো সৈন্য পাঠানো হলো দিল্লীতে, সেই সংগে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর খাদ্যসম্ভার।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগ।

দিল্লী অবরোধ করলো ইংরেজ সৈন্য। সেনাপতি ছিলেন উইলসন্। সৈন্যসংখ্যা সাত হাজার, এর মধ্যে ইংরেজ সৈন্য মাত্র এক হাজার। দিল্লীর সব তোরণগুলিতে কামান রাখা হলো। গরুর গাড়ি করে ভারে ভারে আসতে লাগলো গোলাবারুদ। সিপাহীরা এর কিছুই টের পেলো না।

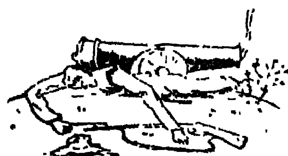
১০ই সেপ্টেম্বর।

ইংরেজের কামান থেকে আরম্ভ হলো অগ্নিবৃষ্টি। দিল্লীর বিখ্যাত প্রাচীর কামানের গোলার প্রচণ্ড আঘাতে দু'জায়গায় ভেঙে গেলো। প্রাচীরের ওদিকে ছিলো সিপাহীদের আস্তানা। সেই সব ভাঙন দিয়ে ইংরেজ সৈন্য কৌশল আর ক্ষিপ্রতার সংগে অভিযান করলো। বখ্‌ত্ খাঁ ছিলেন বিদ্রোহীদের পরিচালক। কিন্তু তাঁর রণ-নৈপুণ্য আদৌ ছিলো না। বখ্‌ত্ খাঁ না পারলেন সিপাহীদের ঠিকমত পরিচালনা করতে, না পারলেন শৃংখলা বজায় রাখতে।

সেনাপতি নিকল্‌সন দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়ে কাশ্মীর-তোরণের কাছে 'মেইন গার্ড' দখল করলেন আর একদল ইংরেজ সৈন্য অধিকার করলো কাবুল-গেট। যুদ্ধ চললো দুই সপ্তাহ—অবিশ্রান্ত যুদ্ধ। ইংরেজপক্ষের পরাজয় হলো। বিদ্রোহীরা চূড়ান্ত

বীরত্ব দেখালো। কিন্তু বাইরে থেকে কোন বড় শক্তির তারা সাহায্য পেলো না বলে ইংরেজের আক্রমণের বেগ ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। সাময়িক জয়লাভে উন্মত্ত হয়ে ইংরেজ সৈন্য দিল্লীর দোকানপাট লুঠ করতে লাগলো। তাদের দেখাদেখি শিখ সৈন্যরাও হয়ে উঠলো উচ্ছৃংখল। আর নিরীহ নির্দোষ লোক মরতে লাগলো ইংরেজ সৈনিকদেব নির্বিচার গুলির আঘাতে।

অবশেষে বন্দী হলেন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্, তাঁর বেগম জিন্নত মহল আর পুত্র জোয়ান্ বখ্ত্। মোগল প্রাসাদে উড়লো কোম্পানীর পতাকা—ইউনিয়ন জ্যাক। বাদশাহের অপর তিন পুত্রও বন্দী হলো। শুধু বন্দীই হলো না—সর্বসাধারণের সামনেই রাজকুমারদের মারা হলো গুলি করে। বাদশাহ্ রইলেন ইংরেজের নজর-বন্দী আর বিচারের নামে প্রতিদিন নির্দোষ লোকদের ধরে ধরে ফাঁসী দেওয়া হতে লাগলো।





সাত

ইংরেজরা দিল্লী অধিকার করলো বটে, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন নিবলো না। পেশোয়ার থেকে পাটনা সর্বত্রই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিলো। পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে একটা বড় সেনানিবাস ছিলো। এখানকার সিপাহীরাও বিদ্রোহী হলো। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে ইংরেজদের প্রবল যুদ্ধ হলো তাদের সংগে। শিয়ালকোটের বারুদখানা উড়িয়ে দিলো

তারা; তারপর ধনাগারের টাকা লুঠ করলো, পুড়িয়ে দিলো কাছারী, জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের দিলো মুক্ত করে। বেলুচ, শিখ আর ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে কর্ণেল নিকল্‌সন দমন করলেন শিয়ালকোটের বিদ্রোহ।

সারা ভারতে যখন এই কাণ্ড চল্‌ছে, দিকে দিকে যখন জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা, তখন বাংলা-দেশের অবস্থা কি রকম? ক'লকাতা শান্ত ছিলো বটে, কিন্তু চারদিকের বিপ্লবের সংবাদে এখানকার ইংরেজদের মনেও দেখা দিলো গভীর আতংক আর উত্তেজনা। স্বেচ্ছাসৈনিকদল গঠন করে কুচ্‌কাওয়াজ করতে লাগলো তারা আর দিনরাত চারদিকে দেখতে লাগলো শুধু বিপ্লবের বিভীষিকা। দেশী সিপাহীকে ইংরেজরা তো অবিশ্বাস করতই, এমন কি ভারতবাসী মাত্রকেই যেন তারা মহাশত্রু ব'লে মনে করতে লাগলো। কাজেই আর সব জায়গার মত বারাকপুরের সিপাহীদেরও হঠাৎ একদিন ছাউনির মাঠে নিয়ে গিয়ে নিরস্ত্র করা হলো। পদ্ধতি সেই এক রকম—পেছনে বারুদভরা কামান আর সামনে সঙীনধারী ইংরেজ সৈন্য।

বড়লাটের রাজধানী তখন ক'লকাতায়।

লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের বড়লাট।

তাঁর প্রাসাদ ও দেহরক্ষার জন্যে দেশী সিপাহীদের বদলে নিযুক্ত করা হলো ইংরেজ সৈন্য।

দেশের মধ্যে যাতে উত্তেজনা আর বেশী না ছড়িয়ে পড়তে পারে, সেজন্যে বড়লাট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন। কোম্পানীর হুকুম ছাড়া কেউ মুদ্রাযন্ত্র রাখতে পারবে না—এইরকম একটি আইন করা হলো। তাছাড়া, দরকার বোধ করলেই কোম্পানীর সরকার যে-কোন খবরের কাগজ বা পুস্তকের প্রচার বন্ধ করতে পারতেন। এরপরই এলো অস্ত্র আইন। ঘোষণা করা হলো বিনা লাইসেন্সে বন্দুক বা তলোয়ার রাখতে পারবে না কেউ।

অযোধ্যার নবাব তখন ক'লকাতায় ইংরেজের নজরবন্দী। তাঁকে রাখা হয়েছিলো ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে। নজরবন্দী নবাবের ওপরও কোম্পানী সন্দেহ করতে লাগলেন।

এইভাবে ক'লকাতার শান্তিরক্ষা হলো। বাইরে শান্তি ছিলো বটে, কিন্তু জনসাধারণের অন্তর তখন কোম্পানীর পীড়নে আর লুণ্ঠনে এমনি বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে বিদ্রোহের অগ্নি-স্রোত ফল্গুনদী-ধারার মত তাদের অন্তঃস্থলে প্রবাহিত হতে লাগলো।

চট্টগ্রামে তখন একদল সিপাহী ছিলো।

দিল্লী, কানপুর ও মীরাটের সংবাদ—বারাকপুরের মংগল পাঁড়ের আত্মদানের সংবাদ—ক'লকাতা পার হয়ে সেখানকার সিপাহীদের কাছে গিয়েও পৌঁছে-ছিলো। ধীরে ধীরে তাদের মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠ্‌ছিলো বিদ্রোহের ভাব। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইংরেজ কাপ্তেন অবস্থা লক্ষ্য করে শংকিত হলেন। চট্টগ্রামে তখন ব্যবসাসূত্রে বাস করতো অনেক ইংরেজ। স্থানীয় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পেতেই তারা প্রাণের ভয়ে ছদ্মবেশে পালিয়ে গেলো জংগল দিয়ে। সেনানিবাসে ইরেজ সৈন্য ছিলো খুব কম, কাজেই সিপাহীরা বিনা বাধায় ধনাগার লুঠ করলো আর জেলখানার কয়েদীদের দিলো মুক্ত করে। তারপর সেনানিবাস পুড়িয়ে ও অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিয়ে তারা যাত্রা করলো ত্রিপুরার দিকে।

ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন কোম্পানীর পরম অনুগত। ইংরেজদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন তিনি. আক্রমণ করলেন সিপাহীদের তাঁর সৈন্য নিয়ে।

ত্রিপুরার মহারাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শ্রীহট্টের সিপাহীরাও ইংরেজপক্ষ থেকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করলো। তখন আর কোন উপায় নেই দেখে

বিদ্রোহী সিপাহীরা মণিপুরের কাছাকাছি দুর্গম বনে পালিয়ে গেলো।' শ্রীহট্টের সিপাহীরা সেখানে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো বার বার, ফলে বিদ্রোহীদের অনেকেই নিহত হলো। যারা বেঁচে রইলো সেই বনের মধ্যে, তাদের অবস্থাও হলো খুবই শোচনীয়।

চট্টগ্রামের ব্যাপার থেকে শিক্ষা লাভ করে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ঢাকার কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দিলেন। সেখানে সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হলো। প্রথমে মালগুদাম ও ধনাগারের সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হলো। কিন্তু মুস্কিল হলো ঢাকার লালবাগের সিপাহীদের নিয়ে। তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ইংরেজ সেনানায়করা তাদের ঘেরাও করে গুলি চালাতে লাগলেন। সিপাহীরাও এর জবাব দিলো প্রচণ্ডভাবে। শেষে ইংরেজ সেনাপতিরা কাবু হয়ে পড়লেন। ঢাকায় বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে বিদ্রোহীরা ছুটলো জলপাইগুড়ির দিকে। খরস্রোতা তিস্তানদীর ধারে ক্যাপ্টেন ইউল কিছু ইংরেজ সৈন্য নিয়ে তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালেন, কিন্তু সিপাহীদের দুর্বার আক্রমণ তিনি প্রতিরোধ করতে পারলেন না। শেষে তারা নেপালের জংগলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেলো অযোধ্যায়।

বিহার।

বিহারে বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন কুমার সিংহ।

এখানে প্রথম থেকেই গভীর উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিলো।

পাটনায় তখন অনেক মুসলমান বাস করতো। পাটনা বিভাগের কমিশনার টেলার সাহেবের কঠোরতার জন্যে কোন মুসলমানই এ সময় নিজেকে এক মুহূর্তও নিরাপদ মনে করতো না। কখন যে কে ফাঁসীকাঠে ঝুলবে, কার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, কিছুই ঠিক ছিলো না। কাওয়াজের মাঠ বধ্য-ভূমিতে পরিণত হলো। সমগ্র পাটনা শহর হয়ে উঠ্‌লো যেন একটি বারুদ-স্তূপ।

তখন পাটনায় তিনজন মৌলভী ছিলেন। মুসলমান সমাজের ওপর তাঁদের প্রত্যেকের প্রভাব ছিলো অসীম। টেলর সাহেবের সন্দেহ হলো মৌলভীদের বাড়িতে বোধ হয় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু সন্দেহ করলেও তিনি তাঁদের প্রকাশ্যে গ্রেপ্তার করতে সাহস পেলেন না। কাজেই কৌশল অবলম্বন করলেন। একদিন তিনি মৌলভীদের নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাংলোয়। সেইখানে তাঁদের নজরবন্দী করে রাখা হলো। এর ফলে পাটনার জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিলো তীব্র অসন্তোষ।

দানাপুর। বিহারের অন্যতম সেনানিবাস।

এখানকার সিপাহীরা শান্তই ছিলো। তারা কোন অবিশ্বাসের কাজ করেনি, বিক্ষোভ পর্যন্ত দেখায়নি, তবু ঠিক হলো তাদের নিরস্ত্র করা হবে। দানাপুরের সেনাপতি ঠিক করলেন সিপাহীদের বন্দুকের ক্যাপ থাকবে ইংরেজ সৈন্যদের কাছে। ভাবলেন, যদি তারা ক্যাপ্ই না পায়, তবে খালি বন্দুক দিয়ে আর কী অনিষ্ট করবে। কিন্তু গোলমাল বাধলো এতেই।

পেছনে কামান, সামনে বন্দুকধারী ইংরেজ সৈন্য দাঁড় করিয়ে রেখে, একদিন সিপাহীদের কাওয়াজের মাঠে সমবেত হবার জন্যে আদেশ দেওয়া হলো। দু'দল সিপাহী এতে বিশেষ উত্তেজিত হলো, কিন্তু তৃতীয় দল বেশ শান্ত ছিলো। দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ সৈন্যরা এই তৃতীয় দলের ওপরই গুলি চালালো। তখন সিপাহীদের চমক ভাঙ্লো। তারা ছাউনির মাঠেই সামরিক পোশাক খুলে ফেলে চলে গেলো। সংগে নিয়ে গেলো অস্ত্রশস্ত্র।

দানাপুর থেকে বিদ্রোহীরা এলো আরায়।

দানাপুরের সিপাহীদের যিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন আর সাহায্য করেছিলেন সকল রকমে তিনি হলেন কুমার সিংহ। বৃদ্ধ রাজপুত তিনি। বিহারে তাঁর কিছু

ভূ-সম্পত্তি ছিলো। তিনি বিহারের বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন। সমস্ত বিহারেই তাঁর এমনি অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিলো যে, আজো বিহারের লোক কুমার সিংহের নামে তাদের মাথা নত করে।

কুমার সিংহ ছিলেন আরা জেলার জমিদার। আরা জেলার কাছাকাছি জগদীশপুরে তাঁর বাস। বৃদ্ধবয়সে পুত্রহীন হয়ে তাঁর জীবন অশান্তিময় হয়ে উঠেছিলো; কিন্তু তাই বলে দেশের ও দশের প্রতি কর্তব্যে তিনি কখনো উদাসীন হননি। প্রথম জীবনে কুমার সিংহ আর পাঁচজন ভূস্বামীর মতই রাজভক্ত ছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কুমার সিংহকে যে খুব সুনজরে দেখতেন তা নয়। রাজপুরুষদের এই মিথ্যা সন্দেহ আর অবিশ্বাস তাঁকে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তুলেছিলো।

সারা ভারতে যখন বিদ্রোহের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন কুমার সিংহের মত প্রভাবশালী লোককে স্ববশে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হলো টেলর সাহেবের। বিদ্রোহ শুরু হবার মাসখানেক পরে একদিন তিনি দূত পাঠালেন কুমার সিংহকে আনবার জন্যে। উদ্দেশ্য ছিলো পাটনার মৌলভী-

দের মত কুমার সিংহকেও কৌশলে বন্দী করা। কিন্তু কুমার সিংহ বুদ্ধিমান রাজপুত, ইংরেজের মতলব বুঝতে তাঁর দেরী হলো না। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি টেলর সাহেবের দূতকে ফিরিয়ে দিলেন। রাজপুতের এই ঔদ্ধত্যে কোম্পানী খুশি হলো না এতটুকু। কুমার সিংহ সেটা বুঝতে পারলেন এবং বৃদ্ধবয়সের কথা ভুলে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন পরাক্রমশালী কোম্পানীর বিরুদ্ধে। শুধু দাঁড়ালো নয়—ভারতব্যাপী সেই বিদ্রোহে একটা বিশেষ ভূমিকাও গ্রহণ করলেন। বিহারের বিদ্রোহ পরিচালনের সকল দায়িত্বই নিলেন তিনি। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন তাঁর ছোট ভাই অমর সিংহ। আরার ইংরেজরা তখন আতংকগ্রস্ত হয়ে একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলো। দুই ভায়ে ঠিক করলেন, সেই বাড়ি অবরোধ করতে হবে।

আরা ও দানাপুরের সিপাহীরা দলে দলে এসে মেনে নিলো কুমার সিংহের নেতৃত্ব। তারা ভাঙলো জেলখানা, মুক্ত করে দিলো কয়েদীদের, লুঠ করলো ধনাগার। তারপর তারা অবরোধ করলো ইংরেজদের আশ্রয়-দুর্গ। এই দুর্গে তাদের সাহায্য করবার জন্যে ছিলো পঞ্চাশজন শিখ সৈন্য। দুর্গ অবরোধ করলো বটে, কিন্তু সিপাহীদের কাছে

অস্ত্রশস্ত্র খুব বেশী ছিলো না ; আর দুর্গটি ছিলো বালিভরা থলে দিয়ে ঘেরা। ফলে, বিশেষ কিছু করতে পারলো না বিদ্রোহীরা। ওদিকে দানাপুর থেকে কাপ্তেন ডানবারের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য জাহাজে চেপে রওনা হলো আরার দিকে। বিদ্রোহীরা পেলো এ খবর। তারা আত্মগোপন করে রইলো আরার দুর্ভেদ্য বনের মধ্যে। জাহাজ যেখানে থামলো, সেখান থেকে কিছুদূর আবার নৌকো চেপে যেতে হয়। নৌকো থেকে সসৈন্যে নামলেন ডানবার।

প্রায় চারশো সৈন্য চলেছে সারি বেঁধে। তখন রাত হয়েছে। চারদিকেই ঘোর অন্ধকার। সৈনিকদল যেমনি আরার কাছাকাছি হয়েছে অমনি পথের পাশের বনের ভিতর থেকে সিপাহীদের গুলি এসে পড়তে লাগলো তাদের ওপর। প্রথম চোটেই নিহত হলেন কাপ্তেন ডানবার। অন্ধকারে বিদ্রোহীদের অবিশ্রান্ত গুলিতে ইংরেজ সৈন্যদলের অনেকেই মারা গেলো। যারা বাকী ছিলো, তারা আরায় না গিয়ে ছুটলো নৌকোর দিকে। সেখান থেকে জাহাজ ছিলো বার মাইল দূরে। রাত ভোর হয়ে এলো। আবার তাদের ওপর চারদিক থেকে গুলি পড়তে লাগলো। চারশো সৈন্যের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশজন জীবন নিয়ে জাহাজে পৌঁছলো।

এই সময়ে মেজর-জেনারেল ভিনসেণ্ট আয়ার সসৈন্যে ক'লকাতা থেকে এলাহাবাদ যাচ্ছিলেন। আরার এই ভীষণ সংবাদ পেয়ে তিনি দানাপুর থেকে আরো কিছু সৈন্য ও কামান নিয়ে আরা যাত্রা করলেন। আরার পথে কুমার সিংহের সৈন্যরা তাঁকে বাধা দিলো। কিন্তু কুমার সিংহের একটিও কামান ছিলো না, তাই তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। আয়ার পৌঁছলেন বটে আরায়, কিন্তু আশীবছরের বৃদ্ধ কুমার সিংহের বীরত্বে ইংরেজ সৈন্যকে বিশেষ বিব্রত হ'তে হ'লো। আয়ারের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো এই রাজপুতের ওপর। তিনি জগদীশপুর পর্যন্ত সৈন্য নিয়ে এলেন। সেখানে গিয়ে কুমার সিংহের বাড়িঘর, দেবালয় সবই ধ্বংস করালেন; ইংরেজ সৈন্যদের হুকুম দিলেন জগদীশপুরের আশেপাশের গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দিতে। সেই সংগে তারা অনেক নিরীহ পল্লীবাসীকেও হত্যা করলো। যারা নিহত হলো তাদের মৃতদেহ টাঙিয়ে দেওয়া হলো গাছে গাছে। তারপর আয়ারের সৈন্যরা দানাপুরে ফিরে গিয়ে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করতে লাগলো। কোনও দিকে না তাকিয়ে তারা জ্বালিয়ে দিলো গ্রামের পর গ্রাম, নরহত্যা আর লুণ্ঠনে চরিতার্থ করতে লাগলো প্রতিহিংসা। কত শ্যামল পল্লী

যে মহাশ্মশানে পরিণত হলো, তার ইয়ত্তা নেই।

জগদীশপুরের বিদ্রোহীদের পরাজয় হলো এমনিভাবে।

কুমার সিংহ তাঁর অন্তঃপুরের মেয়েদের আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অন্য নিরাপদ স্থানে। ইংরেজদের হাতে আত্মসমর্পণ না করে তিনি আশ্রয় নিলেন সাসারামের কাছে একটি পাহাড়ে। কিন্তু তার নামে—তাঁর উৎসাহ আর উত্তেজনায় বহু স্থানের সিপাহীর হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। অনেক যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। জগদীশপুরে গিয়েও কুমার সিংহ চুপ করে বসেছিলেন না। একদিন তিনি গংগা পার হয়ে পাল্কীতে চড়ে যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় গংগার তীরে ইংরেজের কামানের গোলার অতর্কিত আঘাতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। সেই আহত অবস্থায় খাটিয়ায় চড়ে তিনি ফিরে আসেন জগদীশপুরে আর সেই অবস্থাতেই কাপ্তেন লে গ্র্যাণ্ডকে পরাজিত করেন। পরে নিজের চিরপ্রিয় আবাসস্থলের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই বৃদ্ধ বীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কুমার সিংহের মৃত্যুর পর সিপাহীদের আবার দলবদ্ধ করলেন তাঁর ছোট ভাই অমর সিংহ।

নানাস্থানে তিনি ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন।

যেখানেই ইংরেজ দেখে, সেখানেই অমর সিংহের সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে।

পরাজয়ে তারা এতটুকু দমতো না। কৌশলীও ছিলো তারা। জংগলের মধ্যে থাকতো লুকিয়ে, সুযোগমত বের হয়ে আক্রমণ করতো বিপক্ষকে। এইভাবে তারা গয়ার জেলখানা ভেঙে সেখানকার কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়, শহর থেকে তাড়িয়ে দেয় ইংরেজদের।

ঠিক এইসময়ে বিহারের রংগমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন মেজর ডাগ্‌লাস। সংগে তাঁর সাত হাজার সৈন্য। তারা যেমন সুশিক্ষিত তেমনি রণনিপুণ।

সেই সাত হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন ডাগ্‌লাস। তৈরি হলেন যুদ্ধের জন্য। যেমন করেই হোক অমর সিংহকে আয়ত্ত করতেই হবে--এই তাঁর সংকল্প।

কিন্তু এত সৈন্য নিয়েও দু'মাসের মধ্যে তিনি অমর সিংহের বিশেষ কিছু করতে পারলেন না।

তখন এগিয়ে এলেন স্যর হেনরী হ্যাভলক। কৌশলে অমর সিংহের সৈন্যদলকে আক্রমণ করার চেষ্টা করলেন তিনি। সিপাহীদের তাড়া করে

হ্যাভলক পাঁচ দিন পাঁচ রাতে দু'শো মাইল পথ পায়ে হেঁটে পার হলেন। একদিকে ডাগ্‌লাস, অন্য দিকে হ্যাভলক—মাঝখানে বিদ্রোহী সৈন্যদল। কিন্তু ইংরেজের এত আয়োজন, এত উদ্যম, এত কৌশল—শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হলো। সিপাহীরা সুকৌশলে পালিয়ে গেলো।

এইভাবে সাত মাস যুদ্ধের পর অমর সিংহের সিপাহীদলের পরাজয় ঘটলো।

ইংরেজের অধিকারে এলো জগদীশপুর।

কিন্তু সেই সংগে বিহারের অন্যত্র—সিগৌলি, হাজারিবাগ, রাঁচি, চাইবাসা, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানেও উত্তেজিত হয়ে উঠলো সিপাহীরা। সিগৌলির বিদ্রোহী সিপাহীরা সেখানকার সমস্ত ইংরেজকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিলো, লুঠ করেছিলো তাদের ধনসম্পত্তি, জ্বালিয়ে দিয়েছিলো ঘরবাড়ি সব। ছোটনাগপুরে সব সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। এখানে বিদ্রোহীদের সংগে ইংরেজদের যুদ্ধ হয় চাতরায়।





আট

আলিগড়।

যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত শহর আলিগড়। সেই আলিগড়ে এলো বিদ্রোহের ঢেউ।

দিল্লী ও মীরাটের খবরে এখানকার সিপাহীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা দেখা দিলো। এই উত্তেজনার আরো একটা বিশেষ কারণ ছিলো। একজন পল্লীবাসী ব্রাহ্মণের ওপর ইংরেজদের সন্দেহ হয়। তাঁদের ধারণা ছিলো, এই লোকটাই নাকি

কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে নগরবাসীকে। কৌশলে সেই ব্রাহ্মণকে একবার বন্দী করা হলো। যেদিন তাকে ধরা হয় সেইদিনই তার বিচার হলো। বিচারে নিরীহ ব্রাহ্মণের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে প্রকাশ্যস্থানে তাঁকে ফাঁসীকাঠে ঝোলান হ'লো।

সিপাহীরা ক্ষেপে উঠ্‌লো এই ব্যাপারে—কোম্পানীর এই স্বৈরাচারে।

হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল সিপাহীই এই নিরীহ ব্রাহ্মণহত্যার প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠ্‌লো।

ইংরেজরা বেগতিক দেখে আলিগড় ত্যাগ করলো।

কেউ গেলো আগ্রার দিকে, কেউ বা পালিয়ে গেলো মীরাটে।

এদিকে উন্মত্ত সিপাহীরা লুঠ করলো ধনাগার, জ্বালিয়ে দিলো ইংরেজদের ঘরবাড়ি, জেলখানা ভেঙে মুক্ত করে দিলো কয়েদীদের। এটোয়া শহরেও আলিগড়ের ঘটনার পুনরুক্তি ঘট্‌লো। তারপর একে একে মথুরা, ভরতপুর—যুক্তপ্রদেশের প্রায় সর্বত্রই বিদ্রোহ প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। শংকিত কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি আগ্রার সিপাহীদের নিরস্ত্র করলেন।

ভারি মজার ব্যাপার ঘট্‌লো মীরাটের কাছাকাছি মজঃফরপুর নগরে। সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট তখন মিঃ বরফোর্ড। চারদিকের বিদ্রোহের সংবাদে তিনি এমনই ভয় পেয়ে গেলেন যে সর্বস্ব ফেলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত হ'লেন তিনি। সব অফিস-কাছারী বন্ধ করে দিলেন। ধনাগার আর কারাগারের প্রহরায় যে-সব সিপাহী নিযুক্ত ছিলো তাদের নিয়ে বরফোর্ড সাহেব নগরের শেষে নির্জন জংগলে লুকিয়ে থাকলেন। এদিকে প্রহরী না থাকায় জেলখানার কয়েদীরা নিজে নিজেই মুক্ত হলো আর উত্তেজিত জনসাধারণ বিনা বাধায় লুঠ করলো ধনাগার, সরকারী কর্মচারীদের ঘড়বাড়ি সব জ্বালিয়ে ছাই করে দিলো। জেলাময় রটে গেলো যে কোম্পানীর শাসন লোপ পেয়ে গেছে।

বেরিলি। রোহিলখণ্ডের প্রধান নগর বেরিলি।

এখানকার সিপাহীদের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্য দেখা দিলো।

মে মাস শেষ হতে না হতেই জ্বলে উঠ্‌লো ধূমায়মান বহ্নি।

স্থানীয় ইংরেজ আর সামরিক কর্তৃপক্ষ সে আগুনের উত্তাপ অনুভব করলেন।

৩১শে মে রবিবার

সেনানিবাসের সিপাহীরা অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠলো। অশান্ত আর উন্মত্ত।

বেরিলিতে যত ইংরেজ ছিলো ভয় পেলো তারা। কী করা যায়? এতগুলো উন্মত্ত সিপাহীর সামনে এই ক'জন ইংরেজ কতক্ষণ লড়বে? প্রাণের ভয়ে তারা সমবেত হ'লো দূরের একটা আমবাগানের মধ্যে। ওদিকে যে মুহূর্তেই তারা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেলো. সেই মুহূর্তে সিপাহীরা আগুন ধরিয়ে দিলো সে-সব বাড়িতে। আমবাগানে বসেই ভীত, সন্ত্রস্ত ইংরেজ নরনারী সেই অগ্নিশিখার গর্জন শুনতে পেলো। সবাই কিন্তু পালাতে পারেনি। সিপাহীরা তাই যে-কোন ইংরেজকে দেখতে পেলো তাকেই মারলো গুলি করে। বেরিলি সেনানিবাসের বৃদ্ধ সেনাপতি নিহত হলেন। তখন ইংরেজরা আমবাগান ছেড়ে পালিয়ে গেলো নৈনিতালের দিকে। রোহিলখণ্ড হলো বিদ্রোহীদের করতলগত। ধনাগার লুঠ করলো তারা, মুক্ত করে দিলো কয়েদীদের আর হত্যা করলো বাকী ইংরেজদের। রোহিলখণ্ডের সুবাদার হলেন এবার খাঁ বাহাদুর খাঁ। তাঁর বিচারে অনেক ইংরেজের ফাঁসী হলো। ইংরেজদের ওপর খাঁ সাহেব এমন প্রতিশোধ নিয়েছিলেন যে, সেকথা তাদের মনে ছিলো বহুকাল। আজো

রোহিলখণ্ডের লোক খাঁ বাহাদুর খাঁর নাম করে। তারপর তিনি রাজস্ব আদায় করতে লাগলেন দিল্লীর বাদশাহের নামে।

বেরিলির পর শাহজাহানপুর। বেরিলিতে যেদিন এইসব কাণ্ড ঘটলো, শাহজাহানপুরেও সেদিন বিপ্লব দেখা দিলো। ঘোরতর বিপ্লব। ইংরেজদের বাড়িঘর পুড়লো, ধনাগার লুঠ হলো, কয়েদীরা মুক্তিলাভ করলো। সেদিন ছিলো রবিবার। ইংরেজরা -নর, নারী ও শিশু সকলে—গির্জায় গিয়েছিলো উপাসনা করতে। উন্মত্ত সিপাহীরা হানা দিলো সেই গির্জাতে। সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর দৃশ্য। ভিতরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে সমবেত কণ্ঠে চলেছে প্রার্থনা সংগীত, আর বাইরে বিদ্রোহী সিপাহীদের কণ্ঠে ভীম ভৈরব হুংকার—'ইংরেজ লোককো মারো, ইংরেজ লোককো কাটো'। কতক ইংরেজ বেরিয়ে এলো, কতক রইলো গির্জার ভিতরে মেয়েদের রক্ষা করবার জন্যে। ইংরেজদের এ-দেশীয় বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি এনে তাদের প্রভুদের সাহায্য করলো। কিছু সিপাহী তখনো ইংরেজদের পক্ষে ছিলো। তাদের সাহায্য পেয়ে ইংরেজরা শাহজাহানপুর ছেড়ে পালিয়ে গেলো অযোধ্যার কাছাকাছি কোহমদীতে। সারা

রোহিলখণ্ডে তখন প্রতিষ্ঠিত হলো খাঁ বাহাদুর খাঁর রাজত্ব।

ফতেগড়ের সিপাহীদের কাছে গিয়ে পৌঁছলো বেরিলি আর শাহ্জাহানপুরের খবর।

সে-সংবাদ তাদের মধ্যে এনে দিলো এক নতুন উত্তেজনা।

সেই উত্তেজনায় উন্মাদ হয়ে উঠলো সেখানকার সিপাহীরা---বিচলিত হলো তারা।

স্থানীয় ইংরেজরা শংকিত হয়ে পড়লো।

ফতেগড় ছাউনির ভার তখন কর্ণেল স্মিথের ওপর। স্মিথ বুঝলেন, ব্যাপার স্মবিধার নয়। তিনি স্থির করলেন, যারা যুদ্ধ করতে পারবে, এমন ইংরেজদের থাকতে বলে বাকী সকলকে পাঠাবেন কানপুরে। ইতিমধ্যে তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, সেখানে তখন অনেক ইংরেজ সৈন্য এসেছে। দশ-বারোখানা নৌকো ঠিক হলো। সেইসব নৌকো করে শেষরাত্রে একশো সত্তর জনকে ফতেগড় থেকে কানপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বাকী একশো কুড়ি জনকে নিয়ে কর্ণেল স্মিথ আশ্রয় নিলেন দুর্গের মধ্যে গিয়ে। কিন্তু আশ্রয় নিলে হবে কি, সে দুর্গ তেমন সুদৃঢ় ছিলো না, আর উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যও সেখানে সংগ্রহ করা হয়নি।

একশো কুড়ি জনের মধ্যে অস্ত্র ধরবার যোগ্য ছিলো মাত্র ত্রিশ জন। এদের ভরসাতেই স্মিথ আশ্রয় নিলেন দুর্গে। এই সময়ে একদল সিপাহী ইংরেজদের বিরোধী হয়ে উঠলো। তারা ফরাক্কাবাদের নবাব তফজুল খাঁকে নবাব বলে ঘোষণা করলো, জেলখানা থেকে মুক্ত করলো কয়েদীদের, তারপর ধনাগার লুণ্ঠন করলো। আরো একদল সিপাহী যোগ দিলো তাদের সংগে। এই দুইদল সিপাহী মিলে ঠিক করলো ইংরেজদের আশ্রয়-দুর্গ আক্রমণ করবে।

দু'দিন ধরে চললো অবিরাম গোলাবর্ষণ।

অটল উদ্যমে, বীরবিক্রমে ইংরেজরা আত্মরক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু আগেই বলেছি, দুর্গটা তেমন সুদৃঢ় ছিলো না। অনবরত গোলাবর্ষণের ফলে ক'দিন পরেই দুর্গের প্রাচীরে ফাটল ধরলো এখানে ওখানে। সেই সংগে ইংরেজদের দু'টো কামান অকর্মণ্য হয়ে পড়লো, গোলা-গুলিও ফুরিয়ে এলো। মহিলা আর শিশুদের দুরবস্থার একশেষ হলো। নিরুপায় দেখে ইংরেজরা পালাবার চেষ্টা করলো।

তখন বর্ষাকাল। দু'কূল ভাসিয়ে গংগা চলেছে প্রবল বেগে। তিনখানা নৌকো জোগাড় হলো। সেই নৌকোয় চড়ে ইংরেজরা পালিয়ে গেলো

ফতেগড় থেকে। সিপাহীরা প্রথমে ইংরেজদের পালানোর ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি; যখন তারা জানতে পারলো, তখন নৌকো করে অনুসরণ করলো পলাতকদের। দুর্ভাগ্যের ওপর দুর্ভাগ্য। ইংরেজদের একখানা নৌকো আটকিয়ে গেলো চড়ায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে মেরে ফেললো সমস্ত ইংরেজদের—অসহায় নারী আর শিশু গংগার জলে প্রাণ বিসর্জন করতে বাধ্য হলো। শুধু কর্ণেল স্মিথের নৌকোখানা রক্ষা পেয়ে এগিয়ে চললো কানপুরের দিকে।

গোয়ালিয়রের রাজা ছিলেন জয়াজি রাও সিন্ধিয়া।

কোম্পানীর সংগে এক সন্ধি অনুসারে বরাবর তাঁর রাজ্যে তাঁরই খরচে কোম্পানীর একদল সৈন্য রাখা হতো। এই সিপাহীরাও বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। একদিন শহরে জনরব উঠলো, ইংরেজ সৈন্যরা সিপাহীদের আক্রমণ করবে। মুখে মুখে প্রবল হয়ে উঠলো জনরব। ক্ষেপে গিয়ে সিপাহীরা ইংরেজদের আক্রমণ করলো। কুড়ি জন ইংরেজ নিহত হলো।

গোয়ালিয়রের সংবাদ পেয়ে ইন্দোর রাজ্যের সিপাহীরাও বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

ইন্দোরের হোলকার তখন তুকাজী রাও। তুকাজী রাও আর জয়াজী রাও সিন্ধিয়া—দু'জনেই ছিলেন ইংরেজ-ভক্ত। ইন্দোরের সিপাহীরা যে এইভাবে উত্তেজিত হয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করবে তা কেউই মনে করতে পারেনি। বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্ণেল ডুরাণ্ড বাধ্য হলেন পালাতে। বাকী ইংরেজ নর-নারী আশ্রয় নিলো ভূপালের মহারাজার দুর্গে। ইন্দোরে ইংরেজদের ধনসম্পত্তি লুঠ করা হলো, জ্বালিয়ে দেওয়া হলো তাদের ঘর-বাড়ি। সেনা-নিবাসের কর্ণেল প্লাট ও অপর কয়েকজন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারীকে বিদ্রোহীরা গুলি করে মারলো।

আগ্রা।

সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি তাজমহলের পুণ্যপীঠ। মোগলের বহুস্মৃতিপূত সুরম্য হর্ম্যরাজি-শোভিত আগ্রা।

আগ্রার কর্তৃপক্ষ সন্দেহের বশে সিপাহীদের নিরস্ত্র করলেন। সিপাহীরা চলে গেলো সেনানিবাস ছেড়ে।

জুন মাসের শেষে খবর এলো নিমচ ও নাসিরাবাদের বিদ্রোহী সিপাহীরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আগ্রার দিকে আসছে। একদল বিশ্বস্ত সিপাহীকে পাঠানো হলো আগ্রার পথে তাদের বাধা দেবার জন্যে।

কিন্তু যাদের পাঠানো হলো, তারা কয়েকজন ইংরেজ অফিসারকে নিহত করে বিদ্রোহীদের সংগে যোগ দিলো। এই ঘটনায় আগ্রার ইংরেজদের মধ্যে ভীষণ আতংকের সৃষ্টি হলো। তারা সকলে মহিলা ও বালক-বালিকাদের নিয়ে আশ্রয় নিলো আগ্রার দুর্গে। এমনকি ছোটলাটকেও থাকতে হলো দুর্গের মধ্যে গিয়ে। নিমচের বিদ্রোহী সিপাহীদের বাধা দেবার জন্যে ব্রিগেডিয়ার পল্‌হোয়েল আটশো সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন আগ্রা থেকে। বিদ্রোহীদল ছিলো সংখ্যায় দু'হাজার। দু'পক্ষের সাক্ষাৎ হলো শাহ্‌গঞ্জে। যুদ্ধ চললো প্রায় তিনঘণ্টা কাল। ইংরেজপক্ষের অনেক ঘোড়া ও সৈন্য নিহত হলো। বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে ইংরেজ সৈন্য কামান আর নিহতদের ফেলে রেখে পালিয়ে গেলো।

অবশেষে বিদ্রোহীরা সগৌরবে প্রবেশ করলো আগ্রায়। তারা ইংরেজদের ঘর-বাড়ি সব জ্বালিয়ে ছাই করে দিলো, সম্পত্তি লুঠ করলো, সরকারী কাগজ-পত্র সব পুড়িয়ে দিলো। উত্তেজিত সিপাহীরা দুর্গ আক্রমণ না করে ছুটলো দিল্লীর দিকে। আগ্রার দুর্গে তখন ছিলো দু'হাজার ইংরেজ। মোগলের বিখ্যাত মতি-মসজিদ এইসময়ে ইংরেজদের হাসপাতালে পরিণত

হলো। এই শোচনীয় পরাজয়ে ব্রিগেডিয়ার পল্‌হোয়েল হলেন পদচ্যুত।

এর পরের দৃশ্য অযোধ্যা আর লক্ষ্ণৌ।

বাংলাদেশ থেকে যত সিপাহী পালিয়ে এসেছিলো তারা সবাই সমবেত হ'লো অযোধ্যায়। কাজেই অযোধ্যার অবস্থাই ইংরেজদের ভাবিয়ে তুললো বেশী ক'রে। তখন অযোধ্যার প্রধান নগর লক্ষ্ণৌ। গোমতী নদীর তীরে এই সুন্দর শহরটির অধিবাসীদের বেশীর ভাগই মুসলমান। কোম্পানীর শাসনে তারা সকলেই বিরক্ত আর উত্তেজিত ছিলো। এক ফকিরকে একশো ঘা বেত মারা হয়েছিলো বলে এই উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। মে মাসের প্রথম ভাগেই অযোধ্যার একদল পদাতিক সৈন্য নতুন টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করলো। তখন হেনরী লরেন্স জোর ক'রে তাদের নিরস্ত্র করলেন—পদ্ধতি সেই একই—পেছনে কামান, সামনে সঙীনধারী সৈন্য। সিপাহীরা পালিয়ে গেলো। লক্ষ্ণৌতে তখন সিপাহী ছিলো হাজার হাজার। সেনানিবাসটি শহর থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে। রেসিডেন্ট থাকতেন গোমতী-তীরে একটি পাহাড়ের ওপর প্রাসাদতুল্য এক ভবনে। এই রেসিডেন্সীর সীমানার মধ্যেই সরকারী ধনাগারে

সঞ্চিত ছিলো বহুলক্ষ টাকা। রেসিডেন্সী আর ধনাগার রক্ষার ভার ছিলো দেশী সিপাহীদের ওপর; চারদিকের আগ্নেয় পরিবেশ দেখে সেই ভার দেওয়া হলো দেশী সিপাহীর বদলে ইংরেজ প্রহরীর ওপর।*

৩০শে মে। রাত ন'টা।

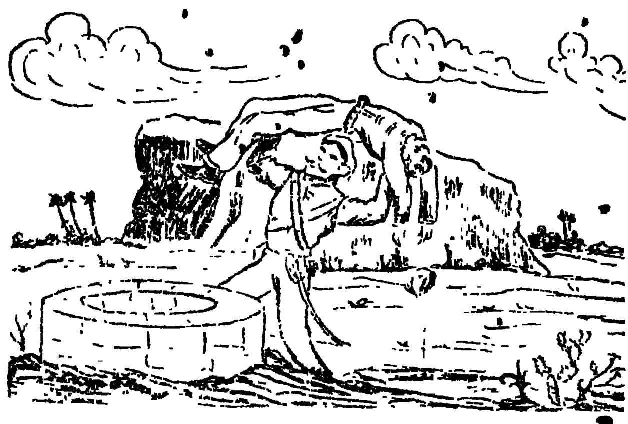
লক্ষ্ণৌর সিপাহীদের মধ্যে আরম্ভ হলো বিপ্লব। দলে দলে বিদ্রোহীরা অফিসারদের বাংলো লুঠ করলো, তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। লক্ষ্ণৌর বিপ্লবের সংবাদে অযোধ্যার অন্য সমস্ত সেনানিবাসের সিপাহীরাও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সিতাপুর, মোহমদী, ফৈজাবাদ সুলতানপুর, দারিয়াবাদ—অযোধ্যার প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান জায়গাতেই লোপ পেলো ইংরেজের প্রাধান্য। সব জায়গাতেই পালাবার সময়ে বহু ইংরেজ বিদ্রোহীদের গুলিতে প্রাণ দিলো। এইভাবে সারা অযোধ্যায় বিদ্রোহের তাণ্ডব নৃত্য চল্‌লো ২৯শে জুন পর্যন্ত। ইংরেজদের বহু কামান হস্তগত করলো বিদ্রোহীরা। সর্বত্রই ইংরেজরা হেরে যেতে লাগলো। অবশেষে অযোধ্যার উত্তেজিত সিপাহীরা আক্রমণ করলো লক্ষ্ণৌতে ইংরেজদের আশ্রয়-দুর্গ। ইংরেজদের ছিলো ত্রিশটি কামান আর অজস্র গোলা-গুলি। বিদ্রোহীরা ঠিক করলো, আশ্রয়-দুর্গটি উড়িয়ে সেগুলো সব নষ্ট

করে ফেলবে। কিন্তু তার আগেই ইংরেজরা বারুদের স্তূপে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেলো রেসিডেন্সীতে। সিপাহীরা তখন আক্রমণ করলো রেসিডেন্সী।

স্যর হেনরী লরেন্স একটি কামানের গোলার আঘাতে নিহত হলেন। রেসিডেন্সী অবরুদ্ধ হলো। ইংরেজ নর-নারী পড়লো চরম দুর্দশায়।

অবশেষে কানপুর-বিজয়ী সেনাপতি হ্যাভলক এসে উদ্ধার করলেন লক্ষ্ণৌ। অবশ্য এ-কাজ তাঁর একার সামর্থ্যে কুলোয়নি। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আউটরাম আর নীল। লক্ষ্ণৌ প্রবেশের পথে সিপাহীদের সংগে তাঁদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে সেনাপতি নীল নিহত হলেন। শেষে হ্যাভলক আর আউটরাম অনেক কষ্টের পর অবরুদ্ধ ইংরেজদের উদ্ধার করলেন।





নয়

বিদ্রোহীরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলো ছ'মাস ধরে।

এই ছ'মাসেই কোম্পানীর রাজত্ব টলমল করে উঠ্‌লো।

তবু বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হলো না নানা কারণে। এর মধ্যে সব চেয়ে বড়ো কারণ, সিপাহীদের মধ্যে একজন উপযুক্ত নেতার অভাব।

সেপ্টেম্বরের শেষভাগ থেকেই কোম্পানী উঠে-পড়ে লাগলো বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে। প্রধান

সেনাপতি স্যর কোলিন ক্যাম্বেল এই উদ্দেশ্যে নানা শহর থেকে সৈন্য আনিয়ে বিভিন্ন বিপ্লবকেন্দ্রে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছিলেন। চীনযাত্রী সৈন্যদের মাঝ-পথ থেকে ফিরিয়ে আনা হলো এই জন্যেই। প্রধান সেনাপতি তখন ক'লকাতায় ছিলেন। একদিন তিনি ঘোড়ায় চেপে উপস্থিত হলেন এলাহাবাদে।

ওদিকে কাপ্তেন নীল কানপুরের পথে নানা জায়গায় সিপাহীদের সংগে যুদ্ধ করে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌর অবস্থা তখনও উদ্বেগজনক। প্রধান সেনাপতি তাই প্রথমে লক্ষ্ণৌ যাওয়াই ঠিক করলেন। শহরে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন, পথ-ঘাট, হাট বাজার সব নিঝুম আর নিস্তব্ধ। লোকালয়গুলিও জনশূন্য। পল্লীগ্রামে একটিও লোক নেই। বিপ্লবের তরংগ যে কতো প্রবলভাবে এ-অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, এ থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা গেলো।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী জংগ বাহাদুর তিন হাজার গুর্খা সৈন্য নিয়ে এসে এই সময়ে ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করেন।

ক'লকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছাতে প্রধান সেনাপতিকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো। সংগে ছিলেন কর্ণেল হোপ গ্রাণ্ট। নানা জায়গাতেই সিপাহীরা

তাঁদের বাধা দিলো। দু'-এক জায়গায় বিদ্রোহীদের কাছে ইংরেজ সৈন্যদের পরাজয় স্বীকার করতেও হলো। এইরকম অলক্ষ্যে, চিন্তাকুল হলেন প্রধান সেনাপতি। সিপাহীরা লক্ষ্ণৌ এমনভাবে অবরোধ করে রেখেছিলো যে প্রধান সেনাপতি স্বয়ং আর সুদক্ষ সেনাপতি হ্যাভলকের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও লক্ষ্ণৌতে প্রবেশ করা সহজ হয়নি। শুধু লক্ষ্ণৌ প্রবেশের যুদ্ধেই ইংরেজপক্ষের পঁয়তাল্লিশ জন উর্ধ্বতন কর্মচারী আর পাঁচশো সৈনিকের জীবন নষ্ট হয়। সেনাপতি হ্যাভলক পর্যন্ত নিহত হলেন। প্রধান সেনাপতি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। লক্ষ্ণৌ থাকা নিরাপদ নয় বুঝে তিনি বাধ্য হয়ে ইংরেজদের আদেশ দিলেন মহিলা আর বালক-বালিকাদের নিয়ে রেসিডেন্সী ত্যাগ করার জন্যে। গভীর রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের আবরণে আত্মগোপন করে ইংরেজরা লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে পৌঁছলো আলমবাগে। স্যর কোলিন তারপর তিন হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন কানপুরের দিকে।

২৭শে নভেম্বর।

স্যর কোলিন ক্যাম্বেল কানপুরে পৌঁছলেন।

তাঁকে বাধা দিতে এগিয়ে এলেন বীর তাঁতিয়া তোপি।

অসাধারণ রণকুশল এই মারাঠি ব্রাহ্মণ সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন নানাসাহেবের দক্ষিণহস্ত। কানপুর-যুদ্ধের পর তাঁতিয়া তোপি গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সিপাহীদলের নেতৃত্ব করেন। সেই সৈন্যদল নিয়ে তিনি কানপুর থেকে সাত মাইল দূরে পাণ্ডু নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সসৈন্যে স্যর কোলিন কানপুরের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছেন, এ সংবাদ তাঁতিয়া তোপি গুপ্তচরদের মুখে আগে থেকেই পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। যে-পথে তিনি কানপুর অগ্রসর হলেন, তার বিশেষ বিশেষ জায়গা অধিকার করে সৈন্য সংস্থাপন করলেন, কামান রাখলেন। এইসব পথ দিয়েই ইংরেজের রসদ-পত্র যেতো। তিনি বন্ধ করে দিলেন এই রসদ সরবরাহের পথ, রচনা করলেন একটি অর্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোম্পানীর ফৌজ এসে পৌঁছালো।

পাঁচঘণ্টা ধরে তুমুল যুদ্ধ হলো দুই দলে।

ইংরেজ সেনাপতি কিছুতেই তাঁতিয়া তোপির ব্যূহ ভেদ করতে পারলেন না। এমনকি, সিপাহীদের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে তাঁর সৈন্যরাও স্থির থাকতে পারলো না। পিছু হট্‌তে বাধ্য হলো তারা। পিছু হট্‌বার সময়ে তারা সন্ত্রস্ত আর বিহ্বল হয়ে

পড়লো। অনেকেই প্রাণ দিলো, আর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বিদ্রোহীদের হস্তগত হলো। পরের দিনই তাঁতিয়া তোপি অধিকার করলেন কানপুর। ইংরেজরা আশ্রয় নিলো মাটির তৈরি পাঁচিলের আড়ালে। ব্রিগেডিয়ার উইলসন নিহত হলেন।

বিঠুর প্রাসাদে বসে এইসব খবর পেলেন নানাসাহেব।

৬ই ডিসেম্বর।

ইংরেজ আর বিদ্রোহীদের মধ্যে আরম্ভ হলো ভীষণ যুদ্ধ।

বিদ্রোহী সিপাহীদের পরিচালনা করলেন নানা-সাহেব আর তাঁতিয়া তোপি; ইংরেজ সৈন্যদের পরিচালনা করলেন প্রধান সেনাপতি নিজে। দ্বিগুণ সৈন্যবল সংগ্রহ করে স্যর কোলিন ক্যাম্বেল এগিয়ে এলেন, সংগে তাঁর শতাধিক কামান। তাঁতিয়া তোপি হেরে গেলেন এই যুদ্ধে। সিপাহীরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেলো বিঠুরের দিকে। পথে কর্ণেল হোপ গ্রাণ্টের সংগে আর একবার যুদ্ধ হলো তাঁতিয়া তোপির। কিন্তু এ-যুদ্ধেও তিনি হেরে গেলেন। অবস্থা সঙীন বুঝে বিঠুর থেকে অনুচরদের সংগে নিয়ে নানাসাহেবও পালিয়ে গেলেন অযোধ্যার দিকে।

ইংরেজ সৈন্যরা জ্বালিয়ে দিলো নানাসাহেবের প্রাসাদ আর মন্দির উড়িয়ে দিলো তোপে।

কানপুরের পর ফতেগড় উদ্ধার করবার চেষ্টা করলো ইংরেজরা। ফতেগড়ে তখনো বিদ্রোহীদের মস্তবড় ঘাঁটি ছিলো।

প্রধান সেনাপতি চললেন সেই দিকে। কালীনদীর তীরে সিপাহীরা তাঁকে প্রবল বাধা দিলো। অনেক ইংরেজ সৈন্য প্রাণ দিলো তাদের তোপের মুখে; কিছু কামানও নষ্ট হলো তাদের। তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। কিন্তু ইংরেজদেরই জয় হলো শেষ পর্যন্ত। বিপক্ষের আক্রমণে ছত্রভংগ আর হীনবল হয়ে পালিয়ে গেলো সিপাহীরা। শেষে বিনা বাধায় ইংরেজ সৈন্য প্রবেশ করলো ফতেগড় দুর্গে। বিদ্রোহীরা প্রায় দশলক্ষ টাকা দামের জিনিসপত্র ফেলে দুর্গ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো; সব অধিকার করলো ইংরেজরা। তারপর চললো তাদের অবাধ অত্যাচার। ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার সাহেবের হুকুমে নিরীহ লোকজনকে বন্দী করা হতে লাগলো। তারপর হলো তাদের বিচার—সে বিচারে একটি মাত্র দণ্ড—ফাঁসী। একদিন বিকেল তিনটে থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত প্রকাণ্ড একটা বটগাছের ডালে কেবল ফাঁসীর পর ফাঁসী চলেছিলো।

১৮৫৭ শেষ হয়ে আরম্ভ হ'লো ১৮৫৮।

বিদ্রোহ নিস্তেজ হয়ে এলো অনেকটা।

কিন্তু লক্ষ্ণৌ আর বেরিলি তখনো বিদ্রোহীদের দখলে।

স্যর কোলিন ক্যাম্বেল অন্যান্য সেনাপতিদের সাহায্যে একত্রিশ হাজার সৈন্য আর দেড়শো কামান নিয়ে লক্ষ্ণৌ অভিযান করলেন। সিপাহীরা পথ-ঘাট সব অবরুদ্ধ করে রেখেছিলো। ইংরেজ সৈন্যরা খুব কৌশলে অগ্রসর হতে লাগলো নানা দিক দিয়ে। ৩রা ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিলো এই অভিযান। ২১শে মার্চ-এর মধ্যেই ইংরেজ সৈন্য উদ্ধার করলো লক্ষ্ণৌ। ইংরেজদের কামানের মুখে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ টিকতে পারলো না। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে পালিয়ে গেলো তারা। যে-সব সিপাহী না পালিয়ে কোন বাড়িতে লুকিয়েছিলো, তাদের ধরতে গিয়ে সেই সব বাড়ি বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হলো।

প্রধান সেনাপতির সৈন্যদলে তিন রকম সৈন্য ছিলো। ইংরেজ, শিখ আর গুর্খা। সেদিন যদি এই গুর্খা আর শিখ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের সংগে যোগ দিতো তাহ'লে হয়তো ভারতের ইতিহাসের চেহারা হয়ে যেতো অন্য রকম। লক্ষ্ণৌ অধিকারের পর ইংরেজ, শিখ আর গুর্খা সৈন্যদল মনের আনন্দে লুঠ

করতে লাগলো। তাদের বাধা দেবার মতো কেউ ছিলো না।

ইংরেজরা লক্ষ্ণৌ অধিকার করলো বটে, কিন্তু সকল বিপদ কাটলো না।

লক্ষ্ণৌ বিদ্রোহের যিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন সেই মৌলভী আহম্মদ উদ্দৌলা শাহজাহানপুরের ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অযোধ্যার বেগম হজরত মহল। মৌলভী সাহেব সব সময়েই সিপাহীদের উৎসাহ দিতেন, প্রেরণা দিতেন স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করতে।

১৫ই মে।

মৌলভী আহম্মদ ইংরেজদের আক্রমণ করলেন।

যুদ্ধ চললো সারা দিন।

বহু সৈন্য নিয়ে প্রধান সেনাপতি এলেন মৌলভীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

ইংরেজদের বিপুল সৈন্য আর অস্ত্রবলের কাছে তাঁর প্রতিরোধ টিকবে না বুঝতে পেরে মৌলভী কয়েকটি জায়গার যাবতীয় দুর্গ ধ্বংস করে সেখান থেকে চলে গেলেন। কিন্তু পথে পোয়াইন নামে একটি জায়গার রাজার ভাইয়ের গুলিতে নিহত

হলেন তিনি। ভাইয়ের এই বীরত্বের জন্যে রাজা কোম্পানীর কাছ থেকে পুরস্কার পেলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাঁতিয়া তোপি আর নানাসাহেবকেও ধরবার জন্যে কোম্পানী এক লাখ টাকা করে দু'লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো। মৌলভীর মৃত্যুতে সিপাহীরা হলো ছত্রভংগ আর ইংরেজরা ছাড়লো স্বস্তির নিঃশ্বাস।

এবার রোহিলখণ্ড।

অযোধ্যা আর লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করে প্রধান সেনাপতি জয় করতে চাইলেন রোহিলখণ্ড।

খাঁ বাহাদুর খাঁ তখনো প্রবল প্রতাপে বেরিলি শাসন করছেন।

তুমুল যুদ্ধ হ'লো দুই পক্ষে; কিন্তু ইংরেজপক্ষেরই জয় হলো। খাঁ বাহাদুর বাধ্য হলেন পালাতে। ৭ই মে ইংরেজ আবার বেরিলি অধিকার করলো।

এইভাবে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ আর অযোধ্যার সব জায়গায় বিদ্রোহের অবসান ঘটলো।

এরপর ঝাঁসি।

ঝাঁসি তখন কোম্পানীর রাজ্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের সংগে কি রকম অন্যায় ব্যবহার ক'রে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলো, আর

তাঁর বৃত্তি কমিয়ে দিয়েছিলো—সে কথা তিনি ভোলেননি। ভোলেননি তিনি লর্ড ডালহৌসির স্বত্বলোপ আইনের কথা—যে আইনের বলে তাঁর দত্তক নেওয়া স্বীকার না করে কোম্পানী তাঁর রাজ্য গ্রাস করেছিলো। ঝাঁসিতে তখন ছিলো একদল পদাতিক, একদল অশ্বারোহী আর কয়েকজন গোলন্দাজ সৈন্য। ক্যাপ্টেন ডানলুপ ছিলেন এদের অধিনায়ক।

সারা ভারত যখন সিপাহী বিদ্রোহে তোলপাড়, সেই সময় একদিন (৩রা জুন) হঠাৎ সৈন্যনিবাসের দু'খানা বাংলো পুড়ে গেলো। ৫ই জুন ঝাঁসির দুর্গ থেকে শোনা গেলো বিদ্রোহীদের বন্দুকের আওয়াজ। ইংরেজরা আশ্রয় নিলো নগরের আর একটা দুর্গে গিয়ে। সেনানিবাসে রইলো খালি ইংরেজ অফিসাররা। বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণ করে প্রায় সকলকেই হত্যা করলো নিষ্ঠুরভাবে। তারপর কয়েদীদের কারামুক্ত করে তাদেরও সংগে নিয়ে বিদ্রোহীরা প্রথমে গেলো দুর্গে। রানীর প্রাসাদ অবরোধ করলো তারা। দুর্গের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ক্যাপ্টেন গর্ডন নিহত হলেন। শতাবধি ইংরেজসৈন্যও মারা গেলো। রানী তখন দেখলেন, কোম্পানীর হাত থেকে ঝাঁসি উদ্ধারের এই সুযোগ। বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। তাঁর নিজস্ব সৈন্য বা গোলাবারুদ বিশেষ কিছুই ছিলো না। বুন্দেল-

খণ্ডের সর্দাররা এগিয়ে এলো তাঁকে সাহায্য করতে। পুরস্ত্রীর বেশ পরিত্যাগ করে যুদ্ধের সাজ পরলেন রানী লক্ষ্মীবাঈ। তলোয়ার হাতে তিনি দুর্গের উপর এসে দাঁড়ালেন বীরাংগনা মূর্তিতে। বিদ্রোহীরা তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো দ্বিগুণ উৎসাহে। ইংরেজরা ভয় পেলো।

১৮৫৮। মার্চ মাস।

ইংরেজ সেনাপতি স্যর হিউরোজ এলেন ঝাঁসি অভিযানে।

অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধের সুবন্দোবস্ত করে ফেললেন। ঝাঁসির মেয়েরাও এগিয়ে এলো তাঁকে সাহায্য করতে। ঝাঁসির চারদিকে ছিলো উঁচু পাঁচিল। প্রধানতঃ এই জন্যেই ইংরেজ সৈন্যের প্রথম দু'দিনের আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'লো।

রানীর অপূর্ব রণ-কৌশল দেখে বিস্মিত হলেন ইংরেজ সেনাপতি। কিন্তু এত করেও রানী ঝাঁসি রক্ষা করতে পারলেন না। গভীর রাতে পুরুষের বেশে আত্মগোপন করে দত্তকপুত্র দামোদর রাওকে পিঠে বেঁধে লক্ষ্মীবাঈ পালিয়ে গেলেন ঘোড়ায় চড়ে। তেরো দিন যুদ্ধের পর ঝাঁসিরাজ্য আবার কোম্পানীর অধিকারে এলো।

লক্ষ্মীবাঈ কিন্তু আশা ছাড়লেন না। কাশীতে পৌঁছে তিনি মিলিত হলেন তাঁতিয়া তোপির সংগে। এখান থেকে দু'মাইল দূরে ইংরেজ সৈন্যের সংগে তাঁর আবার যুদ্ধ হ'লো। এই যুদ্ধে রানী এমন বীরত্বের পরিচয় দিলেন যে, সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যও হটে যেতে বাধ্য হ'লো। কিন্তু এই সময়ে উপস্থিত হ'লো নতুন একদল ইংরেজ সৈন্য। যুদ্ধের গতি ফিরে গেলো অন্যদিকে। রানীকে ফিরতে হলো। তিনি স্থির করলেন গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার করে, স্বজাতি ও স্বধর্মের দোহাই দিয়ে সেখানকার সিপাহীদের সাহায্য চাইলেন। কেননা, ইংরাজের সংগে যুদ্ধ করতে গেলে দরকার দুর্গের আশ্রয়। তাঁতিয়া তোপি রানীর এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। কাশী থেকে রানী সদলে এলেন গোয়ালিয়র।

গোয়ালিয়রের রাজা আর রাজমন্ত্রী ছিলেন ইংরেজদের একান্ত অনুগত। বাইরে তাঁরা রানীর প্রতি খুব সহানুভূতি দেখালেন বটে, কিন্তু গোপনে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে খবর দিলেন যে রানী লক্ষ্মীবাঈ গোয়ালিয়রে।

সকাল হলো।

চরম বিশ্বাসঘাতকতা আর স্বদেশদ্রোহিতার পরিচয় দিয়ে গোয়ালিয়রের মহারাজা বহু সৈন্য

নিয়ে রানীর সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। তাঁতিয়া তোপি এই বিশ্বাসঘাতকতা প্রথমে বুঝতে পারেন নি, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী লক্ষ্মীবাঈ প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পেরেই মাত্র দু'শো সৈন্য নিয়ে রণরংগিনী মূর্তিতে এমন তেজের সংগে আক্রমণ করলেন মহারাজার গোলন্দাজদের যে তারা পালিয়ে গেলো কামান ফেলে। বহু সৈন্য সত্ত্বেও গোয়ালিয়রের মহারাজা পরাজিত হয়ে সবেগে পালালেন আগ্রার দিকে। রানীর এই আশ্চর্য বীরত্বে বিস্মিত আর চমৎকৃত হ'লো সকলে। গোয়ালিয়রের দুর্গ আর ধনাগার তাঁর অধিকারে এলো।

এমন সময় স্যর হিউরোজ বিপুল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন গোয়ালিয়র।

১৮ই জুন।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ।

রানী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষের বেশে সারাদিন যুদ্ধ পরিচালনা করলেন, কিন্তু ইংরেজদের সংগে এঁটে উঠতে না পেরে বাধ্য হলেন যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে। একটি ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেলেন তিনি। কিছু দূর যাবার পর সামনে পড়লো একটা খাল। ক্লান্ত ঘোড়া কিছুতেই সেই খাল পার হতে চাইলো না। দেরী হ'লো পালাতে। সেই সুযোগে কয়েকজন ইংরেজ

এসে আক্রমণ করলো তাঁকে। তলোয়ারের আঘাতে রানীর মাথার একদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, বুকে লাগলো সঙীনের আঘাত—, কিন্তু আঘাত পেয়েও তিনি শত্রুকে বিনাশ করলেন।

কাছেই ছিলো এক সাধুর পর্ণকুটীর। রানীর দেহরক্ষী সর্দার আর পুত্র সেই কুটীরে বহন করে নিয়ে এলো রানীকে।

সেইখানে পবিত্র গংগাজল পান করে রানী লক্ষ্মীবাঈ ত্যাগ করলেন শেষ নিঃশ্বাস।

বিদ্রোহের প্রোজ্বল অগ্নিশিখা অকস্মাৎ অনন্ত জ্যোতির্মণ্ডলে বিলীন হ'য়ে গেলো।





দশ

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো বিদ্রোহের আগুন।

যে আশা, উদ্দীপনা আর উৎসাহ নিয়ে সারা ভারতে কোম্পানীর বিরুদ্ধে সিপাহীরা দাঁড়িয়েছিলো, তার স্রোতে হঠাৎ যেন ভাটা পড়ে এলো। ভারতের জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থন থাকলেও, প্রত্যক্ষভাবে তারা যোগ দেয়নি এই বিদ্রোহে। ঝাঁসির রানীর মৃত্যু বিদ্রোহীদের মনে অনেকখানি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো—তাদের অধিকাংশই বোধ করলো, বিদ্রোহ

ব্যর্থ হয়েছে। সর্বত্রই কেমন একটা অবসাদ দেখা গেলো।

জুন মাস।

তাঁতিয়া তোপি যুদ্ধে হেরে গিয়ে জয়পুরের দিকে চলে গেলেন।

ইংরেজ সৈন্যও ধাওয়া করলো তাঁর পিছু পিছু।

কোম্পানীর দারুণ দুশ্চিন্তা হলো এই স্বদেশ-প্রেমিক মারাঠি বীরকে নিয়ে।

গুপ্তচর সংবাদ নিয়ে এলো, তাঁতিয়া তোপি জয়পুরে। অমনি কোম্পানীর নির্দেশে সেনাপতি রবার্ট্‌স্ সসৈন্যে জয়পুরে উপস্থিত হলেন। গোয়ালিয়র, ঝাঁসি, ভরতপুর, নাসিরাবাদ প্রভৃতি ছটি জায়গায় ছ'দল সৈন্য রেখে ইংরেজ সেনাপতিরা তাঁকে ধরবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। বন জংগল, পাহাড় পর্বত সর্বত্র গুপ্তচর আর সৈন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলো তাঁতিয়া তোপির খোঁজে।

দেখতে দেখতে ন'মাস কেটে গেলো; ইংরেজ তাঁর উদ্দেশ পেলো না; সুচতুর মারাঠি বীরের কোন সন্ধানই মিললো না। এভাবে লুকিয়ে থাকবার সময়ে দু'বার তাঁতিয়া তোপির সংগে সেনাপতি রবার্ট্‌স্-এর সাক্ষাৎ হয় আর দু'বারই তিনি অক্ষত

শরীরে প্রস্থান করেন। এই পলাতক অবস্থায় তাঁর সংগে সব সময় থাকতো একদল বিশ্বাসী আর সাহসী সৈন্য। একদিন তিনি চম্বলনদী পার হয়ে কোম্পানীর অনুগত ঝালরপত্তনের রাজার প্রাসাদ অবরোধ করলেন। রাজার সৈন্যদলকে নিজের দলভুক্ত ক'রে যুদ্ধের খরচের জন্যে রাজার কাছ থেকে পাঁচলক্ষ টাকা আদায় করলেন তিনি। তারপর তাঁতিয়া তোপি এলেন ইন্দোরে।

কিন্তু এমনি করে আর কতদিন চলে? সর্বত্রই ইংরেজ, সর্বত্রই ইংরেজের সৈন্য। কত আর যুদ্ধ করবেন তিনি? সৈন্যদলও তাঁর সংখ্যায় সামান্য। এক এক জায়গায় ইংরেজ সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলেছে, পালাবার পথ নেই, কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে তাঁতিয়া তোপি পালিয়ে গেছেন ইংরেজের চোখে ধূলো দিয়ে। অবশেষে তিনি আশ্রয় নিলেন নিবিড় জংগলে। সেই সময়ে এক সহচরের বিশ্বাস-ঘাতকতায় তিনি বন্দী হলেন ইংরেজের হাতে।

বিচার হলো।

আদেশ দেওয়া হলো প্রাণদণ্ডের।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তাঁতিয়া তোপির

ফাঁসী হলো। সিপাহী বিদ্রোহের দ্বিতীয় দীপ-শিখাটি নিভে গেলো ঝঞ্ঝাবায়ুর নিষ্ঠুর তাড়নায়।

প্রধান সেনাপতি স্যর কোলিন ক্যাম্বেল বিশেষ ক্ষিপ্রতা আর দক্ষতার সংগেই নানাস্থানের বিদ্রোহ দমন করলেন। লক্ষ্ণৌ অধিকার করায় কোম্পানীর কাছে তাঁর খ্যাতি আর প্রতিপত্তি দুই-ই বেড়ে গেলো।

কৃতজ্ঞ কোম্পানী তাঁকে লর্ড উপাধি দিলো। তখন থেকে তাঁর নাম হলো লর্ড ক্লাইভ।

বিদ্রোহ শুরু হয়েছিলো আঠারোশো সাতান্নর গোড়াতেই। তার অবসান ঘটলো আঠারোশো আটান্নর শেষভাগে।

কিন্তু পুরোপুরি শান্তি আর শৃংখলা ফিরে আসতে লাগলো আরো বেশ কিছুদিন।

শেষে ১৮৫৯-এর মে মাসে বিদ্রোহের আগুন একেবারে নিভে গেলো। যে-সব জমিদার আর ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি এই বিদ্রোহে সিপাহীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, একে একে তাঁরা ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। অনেক বিদ্রোহী নেতা নিহত হলেন আর ফাঁসী-কাঠে প্রাণ দিলেন অনেকে। তা ছাড়া, কেউ বনে-জংগলে, পাহাড়-পর্বতে লুকিয়ে রইলেন আর কেউ বা বৃটিশ রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন নেপালে।

বেরিলির খাঁ বাহাদুর খাঁ ধরা পড়লেন। তাঁকেও ফাঁসী দেওয়া হলো।

মিথৌলির বৃদ্ধ রাজা ধরা পড়লেন। তাঁকে দেওয়া হলো আন্দামান-দ্বীপে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড।

নানাসাহেবের কোন রকম উদ্দেশই পাওয়া গেলো না। ইংরেজ অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারলো না তাঁকে।

আর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্?

একদিন যে মোগল বাদশাহের কৃপার ভিখারী হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশিষ্ট ইংরেজরা তাঁর সামনে করজোড়ে, নতশিরে দাঁড়িয়ে থাকতো, এখন সেই পরাক্রান্ত মোগলেরই বংশধর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ হলেন বন্দী—সেই ইংরেজেরই বন্দী। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে তাঁরই দরবার গৃহে বসে, কোম্পানীর কর্মচারীরা তাঁকেই দিলেন নির্বাসন দণ্ড।

বেগম জিন্নত মহলের সংগে সম্রাট্ চিরদিনের মত নির্বাসিত হলেন সুদূর ব্রহ্মদেশের পেগু শহরে। দীর্ঘদিন নির্বাসিত জীবন যাপন ক'রে বাহাদুর শাহ্ পেগুতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিদ্রোহ শেষ হলো।

শেষ হলো স্বাধীনতার প্রথম রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

বিদ্রোহ জয়যুক্ত হলো না বটে, সংগ্রাম সাফল্য-মণ্ডিত হলো না বটে, কিন্তু এরই ভিতর দিয়ে ভারতবাসী যে প্রেরণা লাভ করলো, প্রায় শতবর্ষ পরে তা সার্থক হলো বিয়াল্লিশের বিপ্লবে।

সিপাহী-যুদ্ধে সিপাহীদের আত্মদান ও কষ্টস্বীকার ব্যর্থ হয়েছে, ইতিহাস একথা বলবে না কোনদিন, বরং এই কথাই বলবে যে সতেরোশো সাতান্ন খৃষ্টাব্দের পলাশি-যুদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত আঠারোশো সাতান্ন সালে করা হয়েছিলো বলেই উনিশশো বিয়াল্লিশ খৃষ্টাব্দের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এমনভাবে জয়যুক্ত হতে পেরেছিলো।

কিন্তু এই বিদ্রোহ, এই অভ্যুত্থান যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছিলো তা নয়। একহিসেবে এই সিপাহী বিদ্রোহ সত্যই সার্থক হয়েছিলো। বিদ্রোহীরা যা চেয়েছিলো তাই-ই পেয়েছিলো। তারা চেয়েছিলো কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারী শাসনের উচ্ছেদ। হ'লোও তাই। এই বিদ্রোহের ফলে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটলো।

১৮৫৮। আগস্ট মাস।

ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন মহারানী ভিক্টোরিয়া।

কোম্পানীর হাত থেকে তিনি নিজে গ্রহণ করলেন ভারতের শাসনভার।

রানী ভিক্টোরিয়া হলেন ভারতেশ্বরী।

শাসনভার গ্রহণ করেই ভিক্টোরিয়া তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন।

১৮৫৮। ১লা নভেম্বর।

লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের বড়লাট।

এলাহাবাদে তিনি আহ্বান করলেন এক দরবার।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করলেন তিনি ঃ

"আজ থেকে ভারতবর্ষের শাসনভার কোম্পানীর হাত থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজের হাতে নিলেন।"

সেই সংগে আরো বলা হলো ঃ

"ভারতবাসীর ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে ইংরেজরা

কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না, দেশের প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের প্রতি সম্মান দেখানো হবে।"

দীর্ঘ দিন পরে ভারতবর্ষে আবার শান্তি ফিরে এলো।



পরিশিষ্ট (প্রধান ঘটনাবলী)

১৮৫৭ :	২৯শে মার্চ	ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের সূচনা। মংগল পাঁড়ের ফাঁসী।
	১০ই মে	মীরাটে বিদ্রোহের সূচনা।
	১১ই মে	বিদ্রোহীদের দিল্লী অধিকার।
	১৩—৩১শে মে	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বিদ্রোহ।
	৬ই জুন	এলাহাবাদে বিদ্রোহ।
	৬ই—৮ই জুন	ইংরেজদের দিল্লী-উদ্ধারের চেষ্টা ও বিদ্রোহীদের [illegible] অধিকার।
	২৭শে জুন	বিদ্রোহীদের কানপুর অধিকার।
	২রা জুলাই	লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী অবরোধ।
	২৫শে জুলাই	বিহারের দানাপুরে বিদ্রোহ। ইংরেজদের সংগে কুমার সিংহের যুদ্ধ।
	১৬ই আগস্ট	হ্যাভেলক কর্তৃক বিঠুর আক্রমণ।
	২০শে সেপ্টেম্বর	ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী পুনরধিকার।
	৬ই ডিসেম্বর	ইংরেজদের কর্তৃক কানপুর উদ্ধার।
১৮৫৮ :	২৭শে জানুয়ারি	বাহাদুর শাহের বিচার।
	২১শে মার্চ	ইংরেজ কর্তৃক লক্ষ্ণৌ উদ্ধার।
	১লা এপ্রিল	ইংরেজদের সংগে তাঁতিয়া তোপির যুদ্ধ ও তাঁতিয়া তোপির পরাজয়।
	৩—৪ঠা এপ্রিল	ইংরেজদের সংগে লক্ষ্মীবাঈয়ের যুদ্ধ।
	১৭ই জুন	যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মীবাঈ নিহত।
	আগস্ট	বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি। মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক শাসনভার গ্রহণ।
